ভাষার মূল্যায়ন

পুণ্যশ্লোক রায়

শঙ্কর প্রকাশন ॥ কলকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৫৩

শঙ্কর প্রকাশন, ১৫/১এ, যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে
নিতাই মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও শঙ্কর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
২৬১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬ হইতে
গৌর মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র রায়
ছোট ঠাকুরদাদা
পূজনীয়েষু

সূচী

ভূমিকা

শ্রীমান্ পুণ্যশ্লোক রায় বিশ বছর আগে জার্মানী থেকে ফিরে এসে বাংলাভাষায় একখানি অভিধান গ্রন্থনের বারোয়ারী পরিকল্পনা করেছিলেন। তা ছাড়া এককভাবে হাত দিয়েছিলেন ইংরেজী ভাষায় একখানি বাংলা ব্যাকরণ রচনায়। এমন সময় অযাচিতভাবে আটাশ বছর বয়সে রকেফেলার ফাউণ্ডেশনের ফেলোশিপ পেয়ে আমেরিকায় চলে যান। সেখানে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। দার্শনিক থেকে তিনি হয়ে ওঠেন ভাষাতত্ত্ববিদ্। ইংরেজীতে পর পর দু'খানি বই লেখেন। একখানি বেরোয় হল্যাণ্ড থেকে, অপরটি আমেরিকায়। এর পর দেশে ফিরে এসে তিনি সিমলায় ফেলোশিপ পান ও সেখান থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর আরো একখানি ইংরেজী সন্দর্ভ। এ ছাড়া তিনি ভাষাতত্ত্ব ও দর্শনের উপর বহুসংখ্যক প্রবন্ধ বা পেপার প্রকাশ করেন দেশবিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায়। অধিকাংশই ইংরেজীতে, কয়েকটি বাংলায়। খুব কম লিখলেও তাঁর বাংলা নিবন্ধেরও আদর ছিল। অভিপ্রায়ও ছিল তাঁর বাংলায় আরো বেশী লেখার। নানা কারণে সেদিকে তিনি মনোনিবেশ করতে পারেননি।

এটি তাঁর প্রথম বাংলা বই। এর সাতটি প্রবন্ধের দুটি হচ্ছে তাঁর মূল বাংলা রচনা। গোড়ারটি আর শেষেরটি। মাঝখানের পাঁচটি হচ্ছে তাঁর মূল ইংরেজী লেখার বাংলা তর্জমা। অনুবাদিকা তাঁর জননী লীলা রায়। লীলা রায়

এতকাল বাংলা থেকে ইংরেজী অনুবাদ করে ও ইংরেজীতে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখে খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর মৌলিক সৃষ্টি ভারতে ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এইবার তিনি বাংলায় লিখতে শুরু করলেন। তাঁর মূল বাংলা রচনা অন্যত্র প্রকাশের অপেক্ষায়। ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ এই পুস্তকের সামিল হলো। বৈজ্ঞানিক ভাষাতত্ত্বের দুরূহ মূল ইংরেজীর সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে বাংলায় বাক্যরচনা একপ্রকার অসাধ্য-সাধন। বাক্যগঠন রীতি যদি ইংরেজীর মতো হয়ে থাকে সেটা এমন কিছু অমার্জনীয় নয়। আমি ইচ্ছা করলে বদলে দিয়ে বাংলার মতো করে দিতে পারতুম, কিন্তু তাতে তাঁর শৈলীর সৌরভ নষ্ট হতো। অনুবাদ মোটের উপর মূলানুযায়ী হয়েছে, গ্রন্থকারও অনুমোদন করেছেন। যাঁরা আরো জানতে চান তাঁদের জন্যে মূল ইংরেজী তো রয়েছেই। তার কতক পুস্তকাকারে পাওয়া যায়, বাদবাকী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

শ্রীমান্ প্রদীপ মুখোপাধ্যায় এ গ্রন্থের প্রস্তুতির কাজ সুসম্পন্ন করতে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। আর শ্রীমান্ নিতাই মজুমদার এর প্রকাশনের দায়িত্ব নিয়ে তার জন্যে সুব্যবস্থা করেছেন। এঁদের দু'জনের কাছে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

ভাষার মূল্যায়ন

ভাষাতত্ত্বের ভবিষ্যৎ

ভাষাতত্ত্বে ভারতীয় মনীষীদের দান ইতিহাসে সামান্য নয়। পাণিনি সম্বন্ধে তরুণ প্রতীচ্য ভাষাতাত্ত্বিকদের শ্রদ্ধা অপরিসীম। পাণিনি প্রতীচ্যে পরিচিত হবার পর থেকেই কিছু দশক অন্তর অন্তর দাবি ওঠে এইবার আমরা পাণিনির পর্যায়ে পৌঁছেছি। এরকম দাবির পরে পরে পাণিনি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা বেড়েই এসেছে। Noam Chomsky অতি অল্প বয়সে জগদ্‌বিখ্যাত অধ্যাপক হয়েছেন যে transformational theory-র জন্যে, তার লক্ষ্য সচেতনভাবেই পাণিনির সদৃশ।

আধুনিক কালে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতের সুনাম খানিকটা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। বয়সকালে তাঁর তুল্য দক্ষ ও সুধী পণ্ডিত সারা পৃথিবীতে জোর দশ-বারোর বেশি ছিল না। তাঁর Origin and Development of Bengali Language (১৯২৬ খ্রী) গ্রন্থের মতো কীর্তিও ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে খুব সুলভ নয়।

তাঁর সমসাময়িক বা অল্প ব্যবধানের অনুজ ভাষাবিজ্ঞানীরা অন্ততঃ একটা দিকে বহু উপযুক্ত ছাত্র তৈরি ক'রে দিয়েছেন। তা পুঁথিপাঠ এবং তার ভিত্তিতে ভাষার ইতিহাস উদ্ধার। ইংরেজিতে যাকে philology বা comparative text reconstruction and textual criticism বলে, বাংলায় তার নাম দেওয়া যেতে পারে পাঠতত্ত্ব। উনবিংশ শতাব্দীর জার্মানীতে এই পাঠতত্ত্বের রীতিনীতিগুলি গ'ড়ে ওঠে। ভারতে এই মহৎ বিজ্ঞানের আসন এখন সুপ্রতিষ্ঠিত।

ভাষাতত্ত্ব কিন্তু পাঠতত্ত্বের সীমানা ছাড়িয়ে যায়। বিশেষ ক'রে আমাদের কালে যে সব দিক বিকশিত হয়ে উঠেছে সে দিকগুলো পাঠতত্ত্বের শিক্ষা দিয়ে ধরা যায় না। উদাহরণ দিলে এটা বোঝা সহজ হবে। এখন পর্যন্ত লেখা হয়নি এমন কোনো একটা ভাষার কথা হোক, ধরুন খাসিয়া বা শেরপা বা আঙ্গামী নাগা। এসব ভাষা কী ক'রে শিখতে ও শেখাতে হয় তার পদ্ধতি পাঠতত্ত্বে নেই। ইংরেজ রাজকর্মচারী এবং ক্রীশ্চান মিশনারিরা যেমন-তেমন ভাবে অনেক কাজ করেছেন। কিন্তু ভারতে যে আটশো-র ওপর লিপিহীন ভাষা ও উপভাষা আছে, তার অধিকাংশ সম্বন্ধেই এ পর্যন্ত এক শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য ছাড়া আর কোনো ভারতীয় মনীষী কোনো জ্ঞানের পরিচয় দেখাননি। ভারতের বাস্তব পূর্ণতাকে জানা ও জানানোর ভার বিদেশীদের ওপরেই একান্তভাবে ন্যস্ত।

লিপিহীন ভাষার চর্চা সবচেয়ে বেশি এগিয়েছে আমেরিকাতে। এর শ্রেষ্ঠ গুরু Franz Boas আমেরিকার Red Indian বা Amerindian ভাষাগুলোর যে চর্চা ধরিয়ে দিয়ে যান তার থেকে বহু বিচিত্র বিজ্ঞানপদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। লিপিহীন ভাষার জন্যে উপযুক্ত লিপি বানিয়ে দেবার চেষ্টা থেকে phonemics-এর উৎপত্তি। এ জিনিস মোটেই আগেকার ধ্বনিতত্ত্ব নয়। তফাতটা বোঝানো যায় একটা উদাহরণ দেখিয়ে: চলিত বাংলায় z ধ্বনিটা প্রচুর শোনা যায়—'বজ্র', 'বুঝলাম', 'বুঝতে', 'মেজদা', ইত্যাদি শব্দে। কিন্তু এক বালিগঞ্জের 'জিপ' এবং 'জু' বাদ দিলে এই z ধ্বনিকে কোথাও 'জ' অক্ষরের ধ্বনি হতে পৃথক করা যায় না। অন্যত্র যা জ বা ঝ তাই-ই র ল ত থ দ -এর আগে z, চলিত বাংলার এই-ই আচার। Phonemics-এর নীতি অনুসারে চলতি বাংলা লিপিতে z ধ্বনির কোনো আলাদা সত্তা নেই। অর্থাৎ বাংলা লিপিতে z বা

জ-কে অবাঙালীকে উচ্চারণ শেখানোর সীমাবদ্ধ প্রয়োগের বাইরে সাধারণ লেখাপড়ার ক্ষেত্রে স্থান দেওয়া হবে না।

Phonemics-এর মূল ধারণা এই যে: ধ্বনির বাস্তব রূপ নয়, তার কার্যগত মূল্য বিচার করতে হবে। জ z বালিগঞ্জের বাইরের বাংলায় বাস্তব রূপে ভিন্ন, কার্যতঃ অভিন্ন। কার্য বলতে ভাষার দ্বারা যে কার্য হয় তাই-ই ধরতে হবে। আরেকটা ভালো উদাহরণ নেওয়া যায়। ঢাকার বাংলাতে গ এবং ঘ পৃথক ভাবে উচ্চারিত হয়। কিন্তু ঘ-এর বাস্তব রূপ মানিকগঞ্জে গ-এর সঙ্গে glottal trill, নারায়ণগঞ্জে গ-এর সঙ্গে উঠতি সুরের টান, শুধু অতিশিক্ষিত কয়েকজনের ভাষণেই গ-এর সঙ্গে হ মিলে চলিতের ঘ শোনা যায়। Phonemics-এর নীতি অনুসারে চলিত, মানিকগঞ্জের এবং নারায়ণগঞ্জের ঘ কার্যতঃ একই। প্রায় এক বললে চলবে না—প্রায় নয়, একেবারে এক। এক টাকা মূল্যের চেক, নোট আর মুদ্রা যেমন বাজারের চোখে একেবারে এক।

সঙ্গে সঙ্গে phonetics অর্থাৎ ধ্বনিতত্ত্বের চেহারাও বদলে গেছে কত রকম ধ্বনিই যে মানুষের মুখ দিয়ে বার হতে পারে! এদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ, সে বিশ্বাস চ'লে গেছে। ছাত্র তৈরির পদ্ধতিও তাই অন্য রকম এখন। এমন ভাবে তৈরি হতে হবে যাতে অ-পূর্বকল্পিত ধ্বনির আবিষ্কার সম্ভব হয়। অসমীয়া ত থ দ ধ ন যে প্রতিবেষ্টিত জিহ্বাগ্র দ্বারা দন্ত হতে উৎপন্ন, দন্তমূলীয় যে নয়, এ জ্ঞান বই প'ড়ে পাওয়া যায় না। দল অর্থাৎ syllable আছে অথচ তাতে স্বর অর্থাৎ vowel নেই, জাপানি বা তিব্বতী শোনার আগে এর ধারণা হওয়া দুষ্কর। কোনো flapped fricative অর্থাৎ ঠিকরে-যাওয়া ঘৃষ্ট ধ্বনি যে আদৌ সম্ভব, তা ধ্বনিতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ বইতেও লেখেনি, অথচ চলিত বাংলা 'র' তা-ই।

নতুন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভাষার সুর ও ছন্দ অর্থাৎ intonation-এর শিক্ষা। পদ্ধতি না জানলে এক্ষেত্রে এক পা এগোনো যায় না, কিন্তু পদ্ধতিগুলো একেবারে নতুন, প্রধানতঃ Harold Palmer ও Kenneth Pike-এর কীর্তি। ইংরেজিই ঠিকমতো শেখা ও শেখানো এ-বিদ্যা ছাড়া সম্ভব নয়। আরও সম্ভব নয় তিব্বতি, বর্মি, এমন কি পাঞ্জাবির মতো ভাষা সুষ্ঠুভাবে শেখা ও শেখানো। সংগীতের শিক্ষা থাকলে কিছু সুবিধা হয় বটে, কিন্তু পদ্ধতি না জানার অভাব সত্যি মেটে না।

আর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাক্যগঠন অর্থাৎ syntax-এর চর্চা। বিশেষ ক'রে Kenneth Pike এদিকে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছেন। ভাষায় ভাষায় বাক্যগঠন যে সত্যি কত পৃথক তার পূর্ণ ধারণা এর আগে সম্ভব হয়নি।

নতুন পদ্ধতি চালু হবার ফলে যা আগে অতি দুর্লভ প্রতিভা ছাড়া হতই না, তা এখন সাধারণ বহু M. A বা Ph. D.-ধারীই পারছেন।

এই বাক্যগঠন-ব্যাপারের একটা উদাহরণ দেখা যাক। এর গড়ন ইংরেজীর ঠিক উল্টো। ইংরেজী বাক্যে প্রধান অংশ আগে আসে, অপ্রধান অংশগুলো তার পরে। অপ্রধান অংশগুলির পরম্পরা বদলালে অর্থ বদলায়। যথা—We are sitting here. We are sitting at the table. We are sitting here at the table for supper. We are sitting at the table for supper here, ইত্যাদি। বাংলাতে কিন্তু—বসেছি। খেতে বসেছি। এখানে খেতে বসেছি। খেতে আমরা এখানে বসেছি। —ইত্যাদি। এ বিষয়ে আলোচনা বেশি দূর নেওয়া ঠিক হবে না। নিলে দেখা যাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলা বাক্যগঠন ইংরেজীর প্রতিবর্ত, আয়নাতে যেমন বাম-দক্ষিণ

পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে দেখা যায় তেমনি। এই পার্থক্য অনুভূতিতে পাবার আগে পর্যন্ত ইংরেজের পক্ষে বাংলা কিংবা বাঙালির পক্ষে ইংরেজী ঠিক দখলে আসে না। বাক্যগঠন সম্বন্ধে চর্চা দ্রুত অগ্রসর হয়েছে সুর ও ছন্দ বিচার সম্ভব হচ্ছে ব'লেই। কারণ সুর ও ছন্দ দিয়েই পরিচয় হয় কথ্য ভাষাতে কোন্‌টা কী ধরনের বাক্য এবং কতটা একই বাক্য।

এ ধরনের কথা ফানুস ব'লে মনে হতে পারে, প্রমাণ যদি না দেখানো হয়। সে রকম প্রমাণ দিতে হলে কিন্তু কোনো একটা বিশেষ ভাষার বিশেষ সমস্যা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করতে হবে। সে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার জন্যে একটা সমস্যা ধরা যাক।

প্রথম পরিচয়ে ইংরেজী t d ধ্বনি দুটো মনে হয় বাংলা ট ড-এর সমান। বাংলা নাটকের কথোপকথনে সায়েবরা সর্বদা 'টুমি ডাও' বলে থাকেন। একটু যত্ন ক'রে শুনলে কিন্তু বোঝা যায় ইংরেজী t d ঠিক বাংলা ট ড নয়। তফাতটা কী! তফাতটা জানবার দরকার কী? ইংরেজী শুনতে শুনতে কি t d-এর প্রকৃত উচ্চারণ আপনা থেকে আয়ত্তে এসে যাবে না? অল্পবয়সী শিক্ষার্থী বা অত্যন্ত দক্ষ বহুরূপীর পক্ষে ঠিক বটে। শুনতে শুনতেই তারা ঠিক জিনিসটা আয়ত্তে আনতে পারে। কিন্তু অধিকবয়সী সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে এরকম সম্ভব নয়। বেশির ভাগ বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রলোক জীবনে কখনও t d ঠিক মত শেখেন না, বাংলা ট ড তার জায়গায় চালিয়ে দিয়ে পেরিয়ে যান।

t d-এর যথার্থ প্রকৃতি নির্ধারণ এবং আয়ত্ত করতে হলে একটা পরীক্ষার প্রয়োজন। পদ্ধতি হচ্ছে একটা ছক তৈরি করা। স্থান নির্ধারণের জন্যে যেমন রাস্তাঘাটের মানচিত্র চাই, উচ্চারণ নির্ধারণের

জন্যে তেমনি চাই জিহ্বার গতির মানচিত্র। এ মানচিত্র কাগজ-পেনসিলের নয়, নিজের জিহ্বার মাংসপেশীর শিক্ষায়। বেশ, দেখা যাক কত রকম ট ড জাতীয় ধ্বনি করতে পারি। বাংলা ট .ড-এর জন্যে জিহ্বাগ্র প্রতিবেষ্টিত, স্পর্শ দন্তমূলের ওপর। এর থেকে অন্ততঃ তিনদিকে বৈচিত্র্য আনা যেতে পারে। এক, স্পর্শস্থান বদলানো যায়। দুই, জিহ্বাগ্র প্রতিবেষ্টিত না ক'রে দেখা যায়। তিন, জিহ্বাগ্রের বদলে জিহ্বার পৃষ্ঠাগ্র ভাগ ব্যবহার ক'রে দেখা যেতে পারে।

স্পর্শস্থান বদ্‌লে নিচের দিকে এলে দাঁতের ওপর অসমীয়া ত দ ফোটে। ওপরের দিকে চ'লে গেলে কঠিন তালুর ওপর ওড়িয়া ট ড ফোটে। কোনোটাই ইংরেজী t d-এর মতো নয়। জিহ্বাগ্র প্রতিবেষ্টিত না ক'রে দাঁতের ওপর যা ফোটে তা বাংলা ত দ, দন্তমূলে যা ফোটে তা ব্রিটিশ ইংরেজী t d, কঠিন তালুতে গিয়ে চেনা কোনো ভাষার কোনো ধ্বনি আসে না। জিহ্বাগ্রের পরিবর্তে জিহ্বার পৃষ্ঠাগ্র ব্যবহার ক'রে দাঁতে বা দন্তমূলে যা ফোটে তা চেনা কোনো ভাষার ধ্বনি নয়, কঠিন তালুর সামনের দিকে যা ফোটে তা আমেরিকান ইংরেজীর t d, কঠিন তালুর পেছনের অংশে যা ফোটে তা আবার কোনো ভাষার ধ্বনি নয়। তাহলে এ মানচিত্রের রূপ এইরকম :

	দন্ত	দন্তমূল	কঠিন-অগ্রতালু	কঠিন-পশ্চাৎতালু
প্রতিবেষ্টিত জিহ্বাগ্র	ক ১	ক ২	ক ৩	ক ৪
সরল জিহ্বাগ্র	খ ১	খ ২	খ ৩	খ ৪
সরল জিহ্বাগ্র পৃষ্ঠাগ্র	গ ১	গ ২	গ ৩	গ ৪

ক ২-এ বাংলা ট ড ; খ ১-এর বাংলা ত দ ; ক ১-এ অসমীয়া ত দ ; খ ২-এ ব্রিটিশ t d ; ধ্বনিতাত্ত্বিক সমস্যাটির এই সমাধান হল।

বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে ধ্বনিরাজ্যের আদিবাসীদের মাথা গোনার কোনো চেষ্টা হচ্ছে না। প্রয়োজন মতো স্পর্শস্থান আরো সূক্ষ্মভাবে বা আরো স্থূলভাবে ভাগ করা যেতে পারে। জার্মান t *d*-এর প্রকৃতি নির্ধারণ করতে গেলে দন্ত ও দন্তমূল এই দুই স্থানের মাঝামাঝি একটা স্থান ধরতে হবে। আমেরিকান ইংরেজীর সঙ্গে তুলনা দরকার না থাকলে, শুধু ওড়িয়া বা হিন্দী বা অসমীয়ার সঙ্গে তুলনায় সরল জিহ্বা পৃষ্ঠাগ্রের ব্যবহারগত সিরিজটার কথা ভাববার দরকার নেই। ভূগোলের মানচিত্রে যেমন দ্রাঘিমা ও দেশাঙ্ক প্রয়োজনমতে ডিগ্রি, মিনিট বা সেকেণ্ড পরিমাণে ব্যবহার হয়, এও তেমনি। পার্থক্য শুধু এই যে এখানে কোনো স্থির এবং একমাত্র বিষুব বা গ্রীনউইচ নেই।

কঠিনতর একটা সমস্যার উদাহরণ দিয়ে এই মানচিত্রায়ণ পদ্ধতি বোঝানো যাক। ইংরেজী এবং বাংলার দল (syllable) এক ভাবে গড়া নয়। অনুভূতিতে প্রত্যক্ষ এই পার্থক্যবোধকে বিশ্লেষণ করতে হবে। বেশ, বাংলায় কত রকম দল আছে প্রথমে তাই দেখা যাক। পদ্য পড়তে যেই শিখেছে, সেই জানে বাংলায় দুই দুগুণে চার রকম দল— রুদ্ধ অর্থাৎ হলন্ত এবং মুক্ত অর্থাৎ স্বরান্ত; তাছাড়া সবল এবং দুর্বল। ইংরেজিতে ঠাওর ক'রে দেখলে বোঝা যায় মোট দুরকম দল, সবল এবং দুর্বল। সবল দলে ঝোক বেশি, স্বরটা টেনে যায়, এবং হলন্তের মতো ঠেকে। দুর্বল দলে ঠিক উল্‌টো। স্কটিশ্ ইংরেজীর কথা আলাদা, ব্রিটিশ বা আমেরিকান ইংরেজীর কথাই ধরছি। যে সবল দলে হলন্ত নেই, ধরুন day, তাতেও একটা গতি অনুভব করা যায়, সবল 'এ' ধ্বনি থেকে দুর্বল 'ই' ধ্বনির কাছাকাছি একটা গতি। ইংরেজিতে *i* স্বর ও *y* ব্যঞ্জন পৃথক করা হয়। সে অনুসারে day শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপ dey। আবার, বাংলায় আরো দুরকম দল

ধরা যায়, স্বরাগ্র ও হলাগ্র, যথা 'আর' এবং 'তার'। ইংরেজীতে কিন্তু দুর্বল দলেই এমন বিভাগ করা যায়, সবল দল সর্বদা হলগ্র। আর কোনো ব্যঞ্জন না থাকলে glottal stop থাকবে, বাঙালির কানে তা অবশ্য হয় ঠেকবেই না, বড় জোর ঢাকা অঞ্চলের 'হাতী' প্রভৃতি শব্দের অগ্রভাগে যে glottal trill শোনা যায়, তার তুল্য মনে হবে। মানচিত্রের রূপ তাহলে এই—

	স্বরান্ত ও স্বরাগ্র	স্বরান্ত ও হলগ্র	হলন্ত ও স্বরাগ্র	হলন্ত ও হলগ্র
সবল	ক ১	ক ২	ক ৩	ক ৪
দুর্বল	খ ১	খ ২	খ ৩	খ ৪

ইংরেজীতে মোট পাঁচ রকম দল—ক৪, খ ১-৪। এর মধ্যে সবল দলের পূর্বে খ ১ ও খ ২ এবং সবল দলের পরে খ ১ ও খ ৩ ছাড়া অন্য দল আসে না। বাংলাতে পুরো আট জাতীয়। এই তত্ত্ব বোঝামাত্র পরিষ্কার হয়ে যায় কেন সায়েবের মুখের 'আশু' কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানে 'ass you' লেগেছিল।

শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার গুণে দাগুর মোঙ্গল সম্বন্ধে Samuel Martin যে দেড়শ পৃষ্ঠার ধ্বনিতত্ত্ব ও ব্যাকরণ লিখেছেন তার জন্যে মাত্র আশি ঘণ্টা ইণ্টারভিউ যথেষ্ট হয়েছিল। দ্রাবিড়-পরিবারের কোলামি ভাষা সম্বন্ধে Murray Emeneall যে আরও বড়ো বই প্রকাশ করেছেন তার জন্যে কোলামিভাষী অঞ্চলে তাঁকে মাত্র ছয়সপ্তাহ থাকতে হয়েছিল। কী ধরনের শিক্ষা হলে এত দ্রুত কাজ সম্ভব? এবিষয়ে সর্বাগ্রে জানা দরকার এই কথা। যত্ন যতখানি দরকার, ততখানি কোন শিক্ষা-কেন্দ্রেই ছাত্রের প্রতি দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। ছাত্রকে নিজে নিজেই শিখতে হয় সর্বত্র। ভালো শিক্ষা-ব্যবস্থাতে চেষ্টা বাঁচে না, বাঁচে আয়ু-ক্ষয়।

Phonetics শেখার জন্যে William Smalley-র Manual of

Articulatory Phonetics বই দুখণ্ড এবং তেত্রিশটা সাত ইঞ্চি রীলে recorded tape পাওয়া যায়। Phonemics-এর জন্যে Kenneth Pike-এর Phonemics, Tone Languages এবং The Intonation of American English অবশ্য পাঠ্য। ব্যাকরণের জন্যে Benjamin Elson and Velma Pickett-এর Beginning Morphology and Syntax যথেষ্ট না হলেও অনেক দূর নিয়ে যায়। তারপরে পড়া যেতে পারে Charles Hocket-এর Manual of Phonology। Martin Joos-এর Readings in Linguistics, Eugene Nida-র Morphology, Kenneth Pike-এর Language, Robert Longacre-এর Field Procedures in Grammar ইত্যাদি গ্রন্থ। আরম্ভে পড়া উচিত নয় এমন কয়েকটা বই সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়া উচিত—R. M S. Heffner, Zelling Harris, Noam Chomsky, Henry Allan Gleason Jr., Winfred Lehmann বা Charles Hockett-এর বহুল পরিচিত গ্রন্থাবলী।

আর করা উচিত মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষা নিয়ে সযত্ন অনুশীলন। বিটিশ ইংরেজির জন্যে A. C Gimson-এর Introduction to the Phonetics of English এবং Harold Palmer-এর A Grammar of Spoken English, Daniel Jones-এর Outline of English Phonetics, আমেরিকান ইংরেজীর জন্যে C. K. Thomas-এর The Phonetics of American English এবং Ralph Long-এর The Sentence and Its Parts অবশ্যপাঠ্য।

বাংলার জন্যে আচার্য সুনীতিকুমারের রচনাবলী এবং Language 1960, January সংখ্যায় Charles Ferguson and Munier Chowdhury-র প্রবন্ধ পাঠ্য। জার্মান, রাশিয়ান ও ফরাসীর জন্যে Simon Belasco-র Manual of Applied Linguistics এবং

University of Chicago Constrative Structures সিরিজ ছুটো খুবই ভালো। নানান ভাষা সম্বন্ধে ভালো বই আছে; ভারতের ভাষাগুলো সম্বন্ধেই অতি কম।

ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান কেন দরকার সে সম্বন্ধে দু এক কথা ব'লে প্রবন্ধ শেষ করা যাক। বিশেষ ক'রে বাঙালিরই আজকালকার জগতে নানান ভাষা না জানলে চলছে না। ইংরেজী না শিখলে বিজ্ঞানের সদর দরজা বন্ধ। হিন্দি না জানলে ব্যবসায়ে উন্নতি হবে না। প্রবাসে বহু বাঙালি আছেন, আরো যেতে বাধ্য হচ্ছেন। স্থানীয় ভাষা কিছু না জানলে তাঁদের নানান অসুবিধায় পড়তে হয়। অন্যান্য ভাষার সঙ্গে এই যে যোগ হচ্ছে তা শুধু পেটের দায়ে, একথা সত্যি হলে আত্মাবমাননা হয়। কিছুই নিছক পেটের দায়ে হওয়া উচিত নয়, ভাষা শেখাও নয়। বিভিন্ন ভাষা প্রেম-সহকারে শেখা উচিত। সে প্রেম আসবে তখনি যদি সে ভাষার সাহিত্য এবং রূপের প্রতি কৌতূহল থাকে। কোন্ ভাষা কোন্ ভাষার চেয়ে বড় এ প্রশ্নের মানে আছে, কিন্তু সেটাই একমাত্র প্রশ্ন নয়। কোনও কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন লোক বলবে না যে লাসার কথ্য তিব্বতি ভাষা বাংলার চেয়ে ভাষা হিসেবে মহত্তর। সাহিত্যও যা আছে তা লিখিত তিব্বতীতে, তা আলাদা ক'রে শিখতে হয়। এমন কি রাজনৈতিক গুরুত্বও বেশি খাম, সিকিম বা ভুটানের কথ্য উপভাষাগুলোর। তবু লাসার কথ্য তিব্বতি অনন্য। বৈজ্ঞানিক ভাবে তার অনন্যতাকে বুঝতে পারা, নিজের ভাষণে ফুটিয়ে তুলতে পারা, এতে আত্মার স্ফূর্তি ঘটে। বিচিত্র মানুষ, বিচিত্র তার ভাষা, অনন্য বৈচিত্র্যের বিশুদ্ধ বিজ্ঞান পরম আনন্দময়, ভর্তৃহরির বাণীতে—তদ্ দ্বারম্ অপবর্গস্য।

দর্শনশাস্ত্র ও ভাষা

ভাষা নিয়ে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। ভাষা কী? ভাষা কাকে বলে? অভাষা কী? ভাষা কখন হয় অভাষা? ভাষার কথা কী বুঝে বলি ও তা দিয়ে কী বোঝাতে চাই?

ভাষা সম্বন্ধে তিনটি ধারণা প্রচলিত। এই ধারণাগুলি পৃথক অথচ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। মিল বা অমিল কী কী এবং কোথায়, দেখাতে চেষ্টা করব। পৃথক অথচ সম্পর্কিত এই তিনটি ধারণা কী করে এক সঙ্গে সম্ভব তা হলে বোঝা যাবে। তবে আগে এ টি. আয়ার তাঁর দর্শনে ভাষা সম্বন্ধে কী বলেন দেখা যাক। তিনি একটু গোলমাল সৃষ্টি করেছেন।

দর্শনের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে এ. টি. আয়ার (Ayer) লিখেছেন—

> দার্শনিক ভাবে কোনো একটা ভাষার সম্পূর্ণ রূপ ব্যাখ্যা করতে হলে প্রথমে দেখতে হবে কী ধরনের এবং কত রকম sentence বা বাক্য বেশী ব্যবহার করা হয়। দেখতে হবে নানা বাক্যের মধ্যে সম্পর্কটা কী। একটি বাক্যের symbol বা প্রতীক অন্য বাক্যে বসালে পরে যদি প্রতীকের অর্থ বদলে না যায় বুঝতে হবে দুটি বাক্য এক রকমের। ভাষার গঠন প্রকাশ পায় যখন বাক্যের অর্থ ঠিক থাকে। সুতরাং দর্শনের যে কোন বিশেষ তত্ত্বে—যেমন বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর তত্ত্বে আংশিকভাবে ভাষার গঠন প্রকাশ পায়। দৈনিক ইংরেজী এবং যে ভাষার গঠন ইংরেজীর মতন যেমন ফরাসী ও জার্মান তা নিয়ে রাসেল কাজ করেছেন।

এই ধারণা থেকে এ. টি. আয়ার কিন্তু সরে যান যখন বলেন, দর্শনের সব প্রস্তাব ভাষাতত্ত্বের প্রস্তাব এবং দার্শনিকের কাজ হচ্ছে প্রতীকের বর্ণনা করে তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা। একটা টেক্‌নিক্যাল কথা আছে 'to define in use'. তিনি এই রকম ভাবে কথাটা বুঝিয়ে দেন: প্রতীক বা সিম্বল কী জানবার জন্য আমরা বলি এক প্রতীক অন্য প্রতীকের সমান। ব্যবহারে তার অর্থ দেখানো হয় এক বাক্য অন্য বাক্যে তর্জমা করে। প্রথম বাক্যে প্রতীক থাকে। দ্বিতীয় বাক্যে প্রতীক থাকে না। শব্দার্থের বিশেষ বর্ণনা কেমন করে করতে হয় তার সম্বন্ধে Russell-এর একটা তত্ত্ব আছে। পদ্ধতি এই রকম: একটা বাক্য নেওয়া যাক—"The author of Waverley was Scotch" তর্জমা করে যখন তার জায়গায় লেখা হয়: "One person and only one person wrote Waverley and that person was Scotch" তখন তার অর্থ আরো স্পষ্ট হয়।

এই দিক থেকে দেখতে গেলে প্রত্যেক ব্যাখ্যা বা বর্ণনা বা সংজ্ঞা এক রকম তর্জমা। আয়ার-এর কাছে তর্জমা করা মানে আদি বাক্য এমন ভাবে নতুন বাক্যে পরিবর্তিত করা যাতে তার শব্দার্থ অক্ষরে অক্ষরে ধরা পড়ে। বাক্য সত্য কি মিথ্যা জানবার জন্য এই তর্জমা। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় সত্য মিথ্যা ভাব স্পষ্ট করার জন্য। অক্ষরে অক্ষরে বাক্যার্থ দেখানো হয়।

ভাষার সম্বন্ধে যে ধারণার ওপর এই তত্ত্ব স্থাপিত সেই ধারণাটাই অস্পষ্ট। ভাষার নিম্নলিখিত লক্ষণ আছে। এই লক্ষণের সঙ্গে তুলনা করা যায় অভাষা বা যা ভাষা নয় তার।

প্রথম লক্ষণ—ভাষা একটা সঙ্কেত বা প্রতীকের প্রণালী অর্থাৎ লিখিত চিহ্ন বা উচ্চারিত শব্দের প্রণালী এবং এই প্রণালীর সীমার

মধ্যে সেই সঙ্কেত ও প্রতীক নানাভাবে সাজানো যায়। স্থানান্তর করলে পরে অর্থ অটুট থাকে।

দ্বিতীয় লক্ষণ—ভাষা একটা সঙ্কেত বা প্রতীকের প্রণালী যার সীমার মধ্যে প্রতীক বা সঙ্কেত স্থানান্তর করে সত্য মিথ্যা ফুটিয়ে তুলতে পারা যায়। এই লক্ষণ দুটি পরস্পরের পক্ষে সঙ্গত না-ও হতে পারে। আয়ার যখন ব্যবহারে অর্থ প্রকাশের কথা বলেন, তাতে বেশ খানিকটা দ্ব্যর্থযুক্ত ভাব থাকে। 'All men are mortal'-এর জায়গায় যখন লেখা হয় 'No man is not mortal' তখন বাক্যের ছাঁচ রূপান্তরিত হয় মাত্র। সত্য মিথ্যা নির্ণয় করার প্রশ্ন ওঠে না ওখানে। সঙ্কেত বা প্রতীকের সাজানোর মধ্যেও বিশেষ তফাৎ বা লাভ ঘটে না। রাসেল-এর তত্ত্ব আলোচনা করার সময় যে নমুনা দেওয়া হয়েছে তার মতনও হতে পারে।

তাঁর বই-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় আয়ার তিন রকম প্রভেদ দেখান। তাঁর মতে একটা সেন্‌টেন্স হচ্ছে 'any form of word that is grammatically significant.' অর্থাৎ ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে শব্দ সিরিজের যে কোনরূপ মানে যার আছে। স্টেটমেণ্ট হচ্ছে 'any two sentences are mutually translatable' অর্থাৎ পরস্পরের রূপে যে কোনো দুটি বচন তর্জমা করা যায়। এবং প্রপোজিসন্ বা প্রস্তাব হচ্ছে সেন্‌টেন্স যা হয়ে ওঠে যখন অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়। অতএব আয়ার-এর মতে ভাষা এমন একটা লিখিত শব্দপ্রণালী যার সীমার মধ্যে অর্থ অটুট রেখে একটি বচন অন্য বচনে পরিণত করতে পারা যায় বা এমন একটি প্রণালী যার সীমার মধ্যে বচন রূপান্তরিত করা যায় প্রস্তাবে।

দ্ব্যর্থযুক্ত ভাব আবার আসে যখন আয়ার বলেন 'the material object language' বা বস্তুর ভাষা ও 'sense datum language' বা

ইন্দ্রিয়ভিত্তিক ভাষা তথা ইংরেজী বা ফরাসী ভাষা সম্বন্ধে। আয়ার-এর মতে শব্দার্থের বিশেষ বর্ণনাতত্ত্ব প্রয়োগ করলে দৈনন্দিন ইংরেজীর গঠন আংশিক ভাবে প্রকাশ পাবে। দৈনন্দিন ফরাসী ও জার্মানের বেলাও তাই। যে ভাষার গঠন ইংরেজীর মতন তার বেলায় এই কথা খাটে। টীকায় আয়ার তাঁর মত সংশোধন করতে চেষ্টা করেন: 'দার্শনিক যে ভাষা নিয়ে কাজ করেন সেই ভাষা কৃত্রিম বা অপ্রাকৃতিক। অকারণে এই কথা বলা হয় না। আমরা যে রীতি পালন করে শব্দ ব্যবহার করি সেই রীতি প্রণালী শুদ্ধ সব সময় হয় না।' আয়ারের এই কৃত্রিম ভাষার সঙ্গে Esperanto-র তুলনা করে দেখা যায় যে দ্ব্যর্থযুক্তভাব দূর হয় না। আয়ার যখন বলেন ইংরেজী ফরাসী ও জার্মান ভাষার গঠন এক তখনও দ্ব্যর্থ-যুক্তভাব প্রকট হয়ে ওঠে। বক্তৃতা ইংরেজীতে শুরু করে কি কেউ কথার মাঝখানে ইংরেজী থেকে বিচ্যুত হয়ে ইন্দ্রিয়ভিত্তিক ভাষা অবলম্বন করতে পারে?

ভাষা বলতে ভাষাবিজ্ঞানী যা বোঝেন আয়ার তা বোঝেন না। যে ইংরেজীতে দৈনন্দিন কথাবার্তা চলে বা খবরের কাগজে লেখা হয় সেই ভাষা আয়ার-এর ভাষা নয়। যে ইংরেজী স্কুলে পড়ানো বা রেডিওতে বলা হয় সেই ইংরেজী আয়ার-এর ভাষা নয়। দার্শনিক উল্লেখের বাইরে এই ধরনের ভাষার কোনো অস্তিত্ব নেই। 'God' এই ধরনের একটা শব্দ। একটা অলৌকিক কল্পিত ভাষা। এইখানে আয়ার শ্রেণী বা বিভাগ ভুল করেছেন বা কথা নিয়ে খেলা করেছেন। ভাষা বলতে জনসাধারণ যা বোঝে তিনি তা বোঝেন না। এই কারণে তাঁকে বলা চলে ভাববাদী দার্শনিক।

ভুলটা কোথায়? ভাষা সম্বন্ধে যে তিনটি ধারণা প্রচলিত তিনি তা এক মনে করেছেন। এখানে তাঁর ভুল। ভাষা হচ্ছে:

(১) এমন একটা প্রতীক বা শব্দের প্রণালী যাতে নিয়ম অনুসারে সমার্থ শব্দ বা প্রতিশব্দ স্থির করা হয়ে থাকে। পদ সাজানোর রীতিও স্থির হয়ে থাকে।

(২) এমন একটা প্রণালী যার প্রতীকের অর্থ এতো সুনিশ্চিত যে অনিশ্চিতার্থ বা দ্ব্যর্থযুক্ত ভাবাপন্ন প্রতীক তাতে বসানো যেতে পারে।

(৩) পাশাপাশি যাঁরা থাকেন তাঁরা পরস্পরের সংবাদ দেওয়া-নেওয়ার বেলা যে শব্দ বা প্রতীকেব প্রণালী এবং পদবিন্যাসপদ্ধতি ব্যবহার করেন।

ভাষা সম্বন্ধে প্রথম ধারণাটা বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন আর কারনাপ। অতি স্পষ্টভাবে তিনি তার রূপ দেখিয়েছেন। তিনি বলেন বাক্যের যুক্তিসঙ্গত রূপ ও বাক্যের সঙ্গে বাক্যের যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক নির্ভর করে বাক্যের পদবিন্যাসের প্রকরণের ওপর। সাধারণ একটা ধারণা আছে যে পদবিন্যাসের প্রকরণ এবং যুক্তিসঙ্গত অর্থ বিচারের নিয়ম এক নয়, আলাদা। তিনি এই ধারণা **বাতিল** করতে চান। যুক্তিসঙ্গত অর্থবিচার বা লজিক, পদবিন্যাস বা সিনট্যাক্স-এর অঙ্গ হয়ে যাবে যদি সিনট্যাক্স-এর বিস্তার যথেষ্ট প্রসারিত ও নির্ভুল হয়। তিনি বিনয়ের সঙ্গে বলেন ভাষার একদিক প্রকৃতি-নির্দেশ করে গণিত বা ক্যালকুলাসের মতন। সিনট্যাক্স বা পদবিন্যাস সেই দিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তবে তিনি মনে করেন ভাষা গণিত বা ক্যালকুলাস ছাড়া কিছু নয়। ভাষার আকৃতি প্রকৃতি ক্যালকুলাস-এর মতন হতে পারে কিন্তু তার অন্য একাধিক রূপও আছে। এইসব রূপ কী কী জান্‌তে হলে অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে। একটা উপায় সেমাসিওলজিক্যাল। তার মানে শব্দের অর্থ দেখা। আর একটা উপায় সাইকোলজিক্যাল। তার মানে শব্দ বা প্রতীকের সঙ্গে ব্যবহার ও উপলব্ধির সম্পর্ক দেখা। তৃতীয়

উপায় সোসিওলজিক্যাল অর্থাৎ একটা সমাজের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে লোকে কী ভাবে সংবাদ দেওয়া-নেওয়া করে আসছে তার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ। এই রকম ভাবে কারনাপ গণিতের বিচার অনুযায়ী ভাষা নিয়ে কাজ করেন। সিনট্যাক্স বা পদযোজনা এবং অর্থের বিচার বা যুক্তি এবং ক্যালকুলাস বা গণিত একটা নির্দিষ্ট রূপে গণ্য করেন।

গণিত বা ক্যালকুলাস বলতে কারনাপ কী বোঝেন? তিনি লিখেছেন:

'ক্যালকুলাস নিম্নলিখিত রীতি বা নিয়মের পদ্ধতি। এই নিয়মের উপকরণ তাদের প্রকৃতি এবং সম্পর্ক অনুসারে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। উপকরণগুলি প্রতীক বা পদ কেবল এইটুকু ধরে নেওয়া হয়। এদের কোনো একটা সীমাবদ্ধ শ্রেণীকে বলা হয় গণিত বা ক্যালকুলাস।

ক্যালকুলাস-এর নিয়ম অনুসারে একটা বিশেষ প্রতীক বা পদ কোন অবস্থাতে কোন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হবে স্থির করা হয়। এবং কোন প্রতীক বা পদ কী অবস্থাতে রূপান্তরিত করা যায় তাও ক্যালকুলাস-এর নিয়ম অনুসারে স্থির করা হয়।'

ভাষা তাহলে ক্যালকুলাস হয় কেবলমাত্র তার গঠনে। ভাষা একমাত্র ক্যালকুলাস নয়। কারনাপ মনে করেন প্রত্যেকটি শৃঙ্খলিত প্রণালী এক একটা ক্যালকুলাস এবং তিনি পদযোজনা বা সিনট্যাক্সকে জ্যামিতি ও সম্মিলিত বিশ্লেষণের সঙ্গেও তুলনা করেন।

জার্মানের মত কোনো বিশেষ ভাষার পদযোজনার গঠন কারনাপের কাছে হবে এই রকম: 'এমন একটা ক্যালকুলাস যা ঐতিহাসিক কথাবার্তার অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গতভাবে খাপ খায়। এই ক্যালকুলাস রচনা পদযোজনার প্রণালীর সীমার মধ্যে আবদ্ধ। তত্ত্ব অনুসারে এই ক্যালকুলাস রচিত হয়েছে কি না বিচার করা হবে

ঐতিহাসিক বা ইন্দ্রিয়ভিত্তিক জ্ঞানের দিক থেকে। এই জ্ঞান পদযোজনার প্রণালীর বাইরে।'

জার্মান ভাষার যুক্তিসঙ্গত রূপ বা পদযোজনার গঠন তাহলে হবে সেই ক্যালকুলাস অনুসারে যে ক্যালকুলাস যথোচিতভাবে তার সঙ্গে খাপ খায়। মূল উপকরণগুলি এবং তাদের বিন্যাসের বা রূপান্তরের নিয়ম অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া হয় না। বরং এই নিয়ম ও পদবিন্যাসের প্রণালী অভিজ্ঞতার ওপরে কমবেশী সুবিধা দেখে ন্যস্ত করা হয়।

সুতরাং কারনাপ যখন ভাষার কথা বলেন তিনি নানা রকম গণিতের কথা বলতে থাকেন। তিনি বলতে পারেন 'বিজ্ঞানের ভাষা' বা 'দাবা খেলার ভাষা' বা 'ইংরেজী ভাষা' সব কটা তাঁর কাছে এক একটা ক্যালকুলাস। তাঁর কাছে ভাষা ইন্দ্রিয়ভিত্তিক মোটেই নয়। ইন্দ্রিয়ভিত্তিক ভাষাকে ভাষা বলা চলে যদি রূপবিন্যাসের প্রণালীর সঙ্গে তার মিল থাকে। কত মিল আছে কারনাপ খোঁজ করেন চিন্তায় বা বাস্তব অবস্থায় নয় ভাষার আদর্শ ছাঁচের মধ্যে। তাঁর চর্চার বিষয় সম্মিলিত বিশ্লেষণ—নানা প্রণালীর গঠনে। তিনি দেখেন না কতদূর নিয়মের মধ্যে আনা যায় সাংস্কৃতিক বা গণিতের পদ্ধতি। তিনি জানেন যে কোন একটা প্রণালীতে সব সম্ভাবনা প্রকাশ করা যায় না। বহু নিয়মাবলী বা সিরিজ-এর প্রয়োজন।

ভাষা সম্বন্ধে প্রথম ধারণাটা দ্বিতীয় ধারণার সঙ্গে যুক্ত নয়। আপাত দৃষ্টিতে যদিও তাই মনে হতে পারে। মনে হয় একটা গঠন-প্রণালী বেছে নিয়ে তার মধ্যে অন্য সব প্রকরণ বসালে সেইগুলি অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে। মনে হতে পারে যে যদি পৌরাণিক ও কাল্পনিক বিষয় প্রকরণ হিসাবে বিজ্ঞানের ভাষায় এনে ফেলা হয় তাদের গুরুত্ব

আমরা বুঝতে পারব। গামো প্রশংসনীয়ভাবে বিজ্ঞানের ভাষা দৈনন্দিন ভাষায় তর্জমা করেছেন। আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে ইউ. এস. এ. এবং ইউ. এস. এস. আর.-এর মধ্যে বোঝাপড়া হবে যখন এমন ভাষা আবিষ্কার হবে যা দুপক্ষের কাছে বোধগম্য। তবে এটা একটা কল্পনা মাত্র।

বিশেষ লক্ষণীয় একটা ব্যাপার আমরা উপেক্ষা করছি এই সব কল্পনা করতে গিয়ে। ভাষার সম্বন্ধে যে প্রথম ধারণার কথা বলা হয়েছে তাতে ভাষার প্রকরণে অর্থের স্থান নেই। এই ধারণা অনুসারে ভাষা হচ্ছে লিখিত চিহ্নাবলী বা শোনা শব্দের একটা প্রণালী। এই চিহ্নাবলীর অর্থ বা শব্দের অর্থ তার মধ্যে ধরা হয় না। গঠনপ্রণালীর সঙ্গে তার প্রয়োগ বা ব্যাখ্যার কোনো সম্পর্ক থাকে না। পদ-রূপান্তর ঘটতে পারে অর্থ অটুট রেখে, তবে অর্থের স্থানান্তর বা রূপান্তরের প্রশ্নও ওঠে না। অর্থের তর্জমা ভাষাচর্চার মধ্যে পড়ে না। কাজেই ভাষাবিজ্ঞানের কার্যক্ষেত্রের বাইরে অর্থহীন বিষয়ের রূপান্তর করে তাকে অর্থপূর্ণ করা বা যার সত্য প্রমাণ নেই তার রূপান্তর করে সত্য প্রমাণিত করা বা যাকে ব্যাখ্যা করা যায় না তার ব্যাখ্যা করার প্রশ্নও ওঠে না।

ভাষা সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রচলিত ধারণায় গঠন গৌণ এবং জোর দেওয়া হয় অর্থের ওপর। ভাষা হয় মূল অর্থের চিহ্নাবলী বা প্রতীক অর্থপূর্ণভাবে সাজানোর নিয়মাবলী। এই দৃষ্টান্ত যদি খুঁজি দৈনন্দিন ইংরেজীতে একটা অচল বাক্য পাব, যেমন 'Monday is square'। যদি বলি এটা যুক্তিসঙ্গত নয় তা হলে কারনাপ যাকে যুক্তি বলেন তার সঙ্গে আমাদের যুক্তি মেলে না। ভাষাকে প্রথম প্রচলিত ধারণা থেকে যখন দ্বিতীয় ধারণায় সরিয়ে আনা হয় তখন যে কথাগুলি বা টার্মস্ ব্যবহার করে আসছি ভাষাবর্ণনার বেলা তাদের অর্থেরও একটা

পরিবর্তন ঘটে। যেমন সিনট্যাক্স বা পদযোজনা, স্ট্রাক্চার বা গঠন, লজিক বা যুক্তি, এ্যানালিসিস্ বা বিশ্লেষণ, ট্রানস্লেশন্ বা তর্জমা, ডিস্ট্রিবিউশন বা বিস্তার। গঠন হবে না চোখে দেখা চিহ্ন ও কানে শোনা শব্দের একটা ছাঁচে ফেলা প্রণালী। বরং গঠন হবে সেই চিহ্ন ও শব্দের বোধগম্য উল্লেখযোগ্য সম্বন্ধের আদর্শ প্রণালী। ভাষার এই দুটি প্রচলিত ধারণা স্বতন্ত্র করার জন্য বর্ণনাত্মক বিশেষণ সমূহকে ভাসিয়ে না দিয়ে তাদের সাহায্যে কতকগুলি নতুন টার্মস্ ঠিক করতে হবে। প্রথম প্রচলিত ধারণার জন্য 'গঠন' কথাটা রাখা যাক। দ্বিতীয় ধারণার জন্য কথাটি হোক 'অর্থ' বা মীনিং। যে দুটি কথা ঠিক করলেন সি. মরিস্, 'syntactis ও 'semantics', সে দুটি ব্যবহার করা যেতে পারে। তাদের সঙ্গে L Hjelmslev-র দুটি কথা, 'expression' ও 'content', ব্যবহার করাও চলে। কিন্তু কোনো দুটি কথা নির্ভুল হবে না যতক্ষণ আমরা উপলব্ধি না করি ভাষায় এই দুটি ধারণার মধ্যে ব্যবধান কতখানি।

Meaning বা অর্থ হবে কেবলমাত্র একটা স্থান। সেই স্থানে বসানো হবে সম্পর্ক-প্রণালী এবং যেই সম্পর্ক-প্রণালী গঠন করা হবে পদ ও রূপবিন্যাসের নিয়ম অনুসারে। বাস্তব ক্ষণস্থায়ী পরিবেশে যেখানে বক্তা, বস্তু ও শ্রোতা উপস্থিত সেস্থলের সম্পর্ক নির্দেশ বা বস্তু নির্দেশের অর্থ এই সম্পর্ক-প্রণালী থেকে বিভিন্ন। সম্পর্ক-প্রণালী হবে এমন একটা আদর্শ ছাঁচ যা একাধিকবার প্রয়োগ করতে পারা যায়। এই রকম প্রভেদ যার চোখে দেখা কানে শোনা উপলব্ধি ও ফর্ম বা রূপের মধ্যে অভিন্নতা বা আকৃতি মীনিং বা অর্থ প্রকাশ পাবে না। প্রকাশ পাবে সম্বন্ধ ও সম্পর্কের ভিতর দিয়ে। অর্থের কাঠামোর সীমার মধ্যে মূল অর্থের প্রকরণকে বিশ্লেষণ করতে পারা যায় যেমন রূপের বিশ্লেষণ করা হয় পদবিন্যাস করে রূপের

কাঠামোর মধ্যে। দুটির মিল এতে বেশী যে নজরে পড়ে না। তাদের পার্থক্যের পরিমাণ। মিল থাকার দরুন রূপবিন্যাস ও বিস্তারের সঙ্গে অর্থের ব্যাখ্যা মিশে যাওয়া যথাযথ মনে হতে পারে। এটা হয় যখন বলি শব্দার্থ তার ব্যবহারের নিয়মে প্রকাশিত এবং মনে হতে পারে রূপের ব্যাখ্যা অর্থের কাঠামোতে মিশে যাওয়া যথাযথ। এটা হয় Pesto-র তত্ত্বে। দুটোকেই এড়িয়ে যাওয়া ভালো।

রূপের প্রণালী অর্থের প্রণালী তাদের উল্লিখিত সম্বন্ধের বিস্তারে স্বতন্ত্র। তবে সাধারণভাবে দুটির মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। রূপের প্রণালী এমন হবে যাতে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে। রূপের প্রণালীর প্রকরণ এক পোঁচ কালী বা একটা শব্দের ঢেউ নয়। It is a type, not a token অর্থাৎ নিদর্শনের প্রকার নয়, আদর্শ নমুনা। এটা বহুবার দেখা দিতে পারে কাল ও স্থানের অসীম বিস্তারের মধ্যে বিশেষ কালে শোনা বা চোখে দেখা উপলব্ধিতে বা শারীরিক সাড়াতে। এই আদর্শ নমুনা দেখে সম্পর্ক ব্যাখ্যা বা নির্দেশ করা হয়, বস্তু দেখে নয়। তার অস্তিত্ব তুলনায়, গুণ বৈষম্যে। তার অভিন্ন স্বরূপ নেই। 'x' চিহ্ন যা তা হয় 'y' ও 'z'-এর তুলনায়। 'y' ও 'z'-এর সঙ্গে তার সম্পর্ক তার অর্থে। 'x' যে কী তা জানার দরকার নেই। এইটুকু জানলে হয় যে 'x' থাকাতে এক বাক্যের অর্থ অন্য বাক্যের অর্থ থেকে পৃথক হয়। অথবা 'r' এর জায়গায় 'y' বসাতে পারা যায় অর্থ অটুট রেখে বা 'y' এর জায়গায় 'x' বসানো যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে। সুতরাং রূপের প্রণালীতে অর্থের দরকার আছে, তবে আংশিক ভাবে। দেখতে হবে শুধু বিশেষ অর্থের কোনো পরিবর্তন ঘটেছে কিনা। যদি ঘটে থাকে রূপবিন্যাসের দ্বারা সেটা দেখাতে হবে।

অর্থের প্রণালী গঠনে রূপবিন্যাস বাদ দিলে চলে না। শব্দার্থের

চর্চা শূন্যে হয় না। রূপের পরিবর্তনে অর্থের পরিবর্তন দেখা যায়। অবশ্য রূপপ্রণালী কি ভাবে গঠন করা হয় এবং তাতে কি ভাবে অর্থ প্রকাশ পায় তা শব্দার্থের চর্চার মধ্যে পড়ে না। 'And', 'or', বা 'and/or' এর অর্থ প্রকাশ করতে ভাষার তিনটি রূপ থাকতে পারে। তবে এই তিনটির কি স্থান গঠনপ্রণালীতে এবং তাদের রূপবিন্যাস বা রূপান্তর কি ভাবে হয় তা শব্দার্থের চর্চার মধ্যে পড়ে না। রূপের রকমসকম জানার দরকার নেই। শুধু জানলে হয় সম্ভবত অর্থের পরিবর্তন চিহ্নিত করা হয় রূপের পরিবর্তনে।

গঠনপ্রণালী ও অর্থের প্রণালীর মধ্যে যে পার্থক্য তা কেমন করে অতিক্রম করা যায় বোঝা যাবে যদি বাক্য বা sentence এবং proposition বা প্রস্তাবের মধ্যে প্রভেদটা দেখি। বাক্য বর্ণনা করা যায় এইরকমভাবে—বাক্য এমন এক সারিবদ্ধ প্রকরণ যার পদ পৃথক এবং যা বারবার ব্যবহার করা যায়। অথচ এই সারিবদ্ধ প্রকরণ অন্য এক ধরণের বাক্য কিংবা বাক্যের অঙ্গ নয়। এবং প্রত্যেকটি সারিবদ্ধ প্রকরণ একটা সীমাবদ্ধ শ্রেণীর অন্তর্গত। বাক্যবর্ণনা যদি রূপের দিক থেকে করা হয় বাক্যার্থের কথা ওঠে না। রূপবিন্যাসের নিয়ম অনুসারে বাক্যের গঠন হলেই হল। রূপবিন্যাসের বা গঠনের দিক থেকে এই তিনটি বাক্যে দোষ নেই: (১) Monday is square; (২) The author or Waverley was Scotch; (৩) God is in His heaven। তিনটি অনুমোদিত নিয়মে বা ছাঁচে তৈরী। (১) Noun-verb-adjective বা বিশেষ্য-ক্রিয়া-বিশেষণ (২) determiner-noun-preposition-noun-verb-adjective বা সম্বন্ধ সূচক অব্যয় পদ-বিশেষ্য-অব্যয়পদ-বিশেষ্য-ক্রিয়া-বিশেষণ (৩) noun-verb-preposition-noun বা বিশেষ্য-ক্রিয়া-অব্যয়পদ-বিশেষ্য। এই বাক্য তিনটির মানে আছে কি নেই আমরা তাদের গঠন থেকে জানতে পারব না। অর্থের

প্রণালী থেকে জানা যাবে। সেই অর্থ প্রণালীর প্রকরণ ও বিন্যাসের ভিতর দিয়ে অর্থ প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয় ধারণা অনুসারে ভাষার কাজ হচ্ছে যে প্রস্তাবের নিজস্ব মানে নেই তাকে দিয়ে এমন বাক্য গঠন করা যার মানে আছে এবং যার সত্য মিথ্যা বিচার করা যায়। The author of Waverley was Scotch। দ্বিতীয় ধারণা অনুসারে এই বাক্য হবে শুধু একটা statement অর্থাৎ বিবৃতি। পাকাপাকিভাবে প্রস্তাব বলে গৃহীত হতে পারে না কেন না তার সত্য মিথ্যা অনিশ্চিত। গৃহীত হবার দাবী স্বীকার করা হবে যখন Russell বা Ayer-এর কথামতো বাক্যকে তর্জমা করা হবে। তর্জমা করার ফলে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট হয় এবং তার সত্যতা বিচার করা সম্ভব হয়ে ওঠে। Moore যখন বললেন 'male sibling' বসাতে 'brother'-এর জায়গায় তিনি এই ধরণের তর্জমা করতে বললেন। এক সারিবদ্ধ প্রকরণ বসানো হল অন্য এক প্রকরণের স্থানে। তর্জমার বিশদীকরণের পর প্রথম প্রকরণের বা বাক্যের মানে প্রকাশ পায়। ভাষা তাহলে একটি ভিত্তি বা আধার। ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে অন্য ভাষার দাবী বুঝে নিতে হয়।

বিজ্ঞান ও ভাববাদী দর্শন দুটি থাকে ভাষার মধ্যে। দর্শনের পুরানো অর্থে ভাষা তো দর্শনই। সমগ্র বিশ্ব নিয়ে তার কাজ। ধারণার প্রণালী, সংস্কৃতি, সভ্যতা, অর্থের তত্ত্ব—সবই তার আয়ত্তের মধ্যে পড়ে। সমস্ত সৃষ্টি নিয়ে তার গবেষণা। কোন গাছ কি রঙে সাড়া দেয় যখন প্রাণতত্ত্ববিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখেন তখন বিজ্ঞান হিসেবে ভাষাকে দেখি। রঙের শ্রেণী নির্দিষ্ট করেন তিনি দুটি শব্দ দিয়ে, 'xanthic' এবং 'cyanic', এতে তাঁর কাজের সুবিধা। সাধারণ-ভাবে যে নামে রঙগুলি পরিচিত সেই নাম ব্যবহার করেন না। এখানে লক্ষ্য করা দরকার আশ্চর্য একটা ব্যাপার। পশ্চিম আফ্রিকায়

Bassa বলে একটা ভাষায় রঙ এইরকম দুটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত 'zinza' ও 'hui'-এর হুবহু মিল 'xanthic' 'cyanic' এর সঙ্গে। দোকানে কেনাকাটা করার সময় 'cyanic'-এর জায়গায় 'hui' বসালে চলে। আর একটা ব্যাপার উল্লেখ করা যায় এখানে। মিশরবাসী উটচালক ১০০টি নাম দিয়ে উটকে চেনে। ভাষা বিজ্ঞানীরা ৮০০টি পরিভাষা ব্যবহার করেন বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে। এই ৮০০টি পরিভাষা যোগ করা হয় জনসাধারণের কথার সঙ্গে।

ভাববাদী দর্শনের দিক থেকে ব্যাখ্যা করেন আয়ার তাঁর নূতনতম বইতে। তিনি লেখেন ঃ 'কি ভাবে আমরা ব্যবহার করি বা ব্যবহার করতে ভালোবাসি এই ক্রিয়াপদ 'to know' সেটা এক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হয়। আমাদের যুক্তি ভাষাভিত্তিক। তাই বলে শব্দার্থ নিয়ে কোনো বিবাদ নেই। ইংরাজী ভাষার সঙ্গেও আমরা বাঁধা নয়। আমাদের জানবার বিষয় হচ্ছে এই ক্রিয়াপদকে দিয়ে কি কি কাজ হয়। ক্রিয়াপদটি 'to know' নাও হতে পারত। কাজ নিয়ে কথা, শব্দ নিয়ে নয়। কোন্ সামাজিক অবস্থায় কি ভাবে কোন্ কথা ব্যবহার হয় সাধারণ কথাবার্তায়, তা আমাদের তদন্তের বিষয় নয়। কিছু এসে যায় না যদি সাধারণ ব্যবহারে শব্দ প্রয়োগ আলাদা হয়। তবে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা চাই নিজেদের ব্যবহার সম্বন্ধে। শব্দ ব্যবহারের কথা যখন বলি তখন যে কোন ভাষায় যে কোন শব্দ ব্যবহারের কথা বলি, যদি সেই শব্দ দিয়ে একই কাজ হয়। কাজ কি শব্দ কি বস্তু কি—কোনটা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে সেটা গৌণ। দার্শনিক জানতে চান শব্দ যার প্রতীক তার বাস্তব বর্ণনা।

ভাববাদী দর্শনে বাস্তবের স্বরূপ চর্চা করা হয়ে থাকে।

ভাষাকে এক দিক থেকে দেখলে মনে হয় যখন কেউ কিছু বোঝেন এবং যা বোঝেন তাই বলেন তখনই ভাষা তৈরী হয়।

তৈরী হয় পুরনো বা নতুন নিয়মে। প্রত্যেক বিজ্ঞানী বা ভাববাদী দার্শনিক নূতনত্ব আনেন ভাষায়। কেউ কম কেউ বেশী। বিধিবদ্ধ ভাষার বিশ্লেষণে বিজ্ঞান ও দর্শন প্রকাশ পায়। সাধারণ ভাষার বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে নালিশ করতে পারি এবং একটা নিখুঁত আদর্শ ভাষা তৈরী করতে চেষ্টা করতে পারি। বিপরীতভাবে আদর্শ ভাষার সংকীর্ণতা ও কৃত্রিমতার নিন্দা করে আমরা সাধারণ ভাষার সাধারণ জ্ঞান ও বিস্তার বা প্রসারের প্রশংসা করতে পারি এবং পুনরায় তার আয়ত্তের মধ্যে ফিরে যেতে চেষ্টা করতে পারি। অবিচলিতভাবে বলা চলে তা হলে 'The language of fox hunting' বা 'The sense-datum language' অথবা 'The English language.' ইংরেজী ভাষা হবে একটা সঙ্গতির বিশেষ কাঠামোর মধ্যে বোধগম্যতার একটা নির্দিষ্ট উপলব্ধির পরিসর।

স্থান-কালের সঙ্গে বোধগম্যতার এমন সঙ্গত কাঠামোর কোন যোগাযোগ নেই। সমাজের সঙ্গেও নেই। রঙের বর্ণনা করতে দুটি শব্দ প্রয়োগ করা হয় পশ্চিম আফ্রিকার অসভ্য জাতির ভাষায় এবং অতি উঁচুদরের ইউরোপীয়ান ভাষাতেও। বিজ্ঞানের ভাষা সব উঁচু-দরের ভাষাতেই এক। এমন কি যে পরিবেশে একটার সঙ্গে অন্যটার কোন সম্পর্ক নেই সেখানেও। কোন একটা শব্দার্থ প্রণালী কোন একটা বিশেষ বাস্তব অবস্থার সঙ্গে বাঁধা নয়। রূপের প্রণালীও বাঁধা নয়। সম্ভবপর আদর্শ প্রণালী বানানো হয় দুটোতে। এর প্রয়োগ বা নির্বাচনে কোনটা লাগে না।

তৃতীয় ধারণায় ভাষাকে দেখা হয় বিপরীত দিক থেকে। এই মতে ভাষা একটা সীমাবদ্ধ সাংস্কৃতিক সম্ভাবনারাশি। ইংরেজী ফরাসীর সঙ্গে এই ভাবে তুলনা করা হয় এবং দক্ষিণ অঞ্চলের ইংরেজী লণ্ডনের cockney-র সঙ্গে। একটা উপভাষার সঙ্গে অন্য উপভাষার

তুলনা হতে পারে। উপভাষা ও ভাষার মধ্যে তফাৎ রাজনৈতিক। উপভাষা যখন স্বীকৃতি পায় এবং রাজনৈতিক কারণে তাকে বড় করে তুলে দেখানো হয় তখন উপভাষা হয় ভাষা। কাজের বেলায় উপভাষা ও ভাষা আলাদা রাখার প্রয়োজন আছে। তবে ভাষা-বিজ্ঞানে উপভাষাকে আলাদা করে দেখার দরকার নেই, কেন না তার সীমাবদ্ধ পরিসরে একটা উপভাষা কোন ভাষার চেয়ে কম নয়।

ভাষার ইন্দ্রিয়ভিত্তিক বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে বিশেষ ভাষার প্রকৃতিসঙ্গত স্থিরীকৃত বিধি পরিদর্শন করে দেখা। বলা চলে না আর 'sense-datum language' বা 'ordinary language'। অভিজ্ঞতা থেকে এগুলি আসে না। যে ধরণের ইংরেজী বা অন্য কোন ভাষার নকল করা হয় বেশী তারই বর্ণনা করা আমাদের কাজ। ভাষা সম্বন্ধে এই ধারণা ব্যাকরণবিজ্ঞানীরা বা ভাষাবিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরে পোষণ করে আসছেন। তবে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা একাধিক ভাষার গঠন ও বিন্যাসপ্রণালী নিয়ে চর্চা করে থাকেন। এই ভাষাগুলির গঠনের মধ্যে মিল থাকতে পারে অমিলও থাকতে পারে। স্বতন্ত্র বা স্বাধীনভাবে এই ভাষাগুলি পাশাপাশি বা পর পর সাজানো থাকতে পারে। পরস্পরের ওপরে নির্ভর করতে পারে বা জড়িত থাকতে পারে। নকলযোগ্য যে ভাষা পাণিনি জানতেন তারই বর্ণনা তিনি করেছেন। অন্য কোন ভাষার গঠন বা বিন্যাসপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। আধুনিক ভাষজ্ঞানী বহু ভাষার গঠন, পদ-বিন্যাসপ্রণালী ও ব্যবহার সমাদরের সঙ্গে দেখেন।

একটি ভাষা—প্রথম ও দ্বিতীয় ধারণা অনুসারে—অনেকগুলি ভাষার সমাবেশ মাত্র। এই ভাষাগুলি বদলাতে থাকে। সবকটি ভাষা বিশেষ সমাজে স্বীকৃতি পায়। প্রকৃতিসঙ্গত স্থিরীকৃত ভাষার বিধি বা normative system বলা হয় কাকে? অসমান শক্তি নিয়ে

ব্যক্তির কথাবার্তা ও চালচলন যে শাসন করে এমন একাধিক নির্দিষ্ট পদবিন্যাস বা শব্দপ্রণালীর অনির্দিষ্ট পুঞ্জ বা সমূহ। এই পুঞ্জ সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণে সীমাবদ্ধ এবং তার মধ্যে বিভিন্ন রকম ভাষা গঠনপ্রণালী থাকে। এই প্রণালীগুলির মধ্যে যোগাযোগ থাকে না এবং আলাদা ভাবে বার বার ব্যবহার করাও চলে। ভাষার স্বরবর্ণ একটা প্রণালী, তার ব্যঞ্জনবর্ণ আর একটা, তার সুর বা intonation আরো একটা। যোগাযোগ না-ও থাকতে পারে এইসব প্রণালীর মধ্যে এবং নানা ভাবে সাজানো চলে এদের। দুটি ভাষার স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ ও সুর আলাদা হতে পারে। অর্থবিন্যাসের প্রণালীর মধ্যেও অনেক বেশী অমিল থাকে। ইংরেজী অক্সফোর্ড অভিধানে দশটি বিভিন্ন অর্থ দেওয়া হয়েছে ভাষা ব্যাখ্যা করে। প্রত্যেকটির সঙ্গে একটি অর্থের জাল আলাদা রয়েছে বৈষম্য প্রদর্শন করে।

অন্যান্য ভাষার তুলনায় কোনো বিশেষ ভাষার বর্ণনা করতে হলে তার অন্তর্গত প্রণালীকে বিশেষ সমাজ ও বিশেষ যুগে বসাতে হয়। এই প্রচেষ্টা কখনও পুরোপুরিভাবে সফল হয় না, যুগে যুগে ভাষার প্রণালী রূপান্তরিত হতে থাকে। যখন দেখি বাংলায় রঙের জন্যে ব্যবহৃত শব্দ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত তখন আমরা বুঝতে পারি এটা কেমন করে হয়। বাংলার সকার ধ্বনি sibilants সম্মিলিত অথচ বিপরীত প্রণালীর সঙ্গে দুটি বিপরীত অসমান প্রণালীর মীমাংসা। প্রথম প্রণালী সামাজিক সমর্থন বেশী এখনও পায়। গঠনের দিক থেকে ভাষা বিশ্লেষণ করে একটিমাত্র calculus পাওয়া যায় না। বরং ছোটো ছোটো calculi-র সারি দেখা যায়। এগুলির মধ্যে এক একটা পালা করে ফিরে ফিরে আসে বা একটির ওপরে আর একটি বিস্তৃত হয়। শব্দার্থ প্রণালী বিশ্লেষণ করে যা পাওয়া যায় তা Roget's Thesaurus ও Duden's Pictorial Word-finder দুটির

মাঝামাঝি একটা কিছু। ভাষার একতা আসে না কোনো একটা গঠনপ্রণালী বা শব্দার্থপ্রণালী থেকে। এই দুটি প্রণালীর সমাবেশ মেঘের মতন। তার সীমা কোথায়? তাঁর অবিচ্ছিন্নতা কিসের? একতা কোনখানে? ভালো করে বোঝা যায় না। মোটামুটিভাবে আমরা দেখি। সমস্যার সমাধান হয় না।

তৃতীয় ধারণা অনুসারে চর্চা করতে হলে ভাষাবিজ্ঞানী প্রথম ও দ্বিতীয় ধারণা বাদ দিতে পারে না। প্রথম ধারণা অনুসারে ব্যাকরণ ও phonology চর্চা বিষয়ের মধ্যে পড়ে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও যুক্তিবিজ্ঞান থাকে সঙ্গে। দ্বিতীয় ধারণা অনুসারে অলঙ্কারশাস্ত্র বা rhetoric এবং শব্দকোষ সঙ্কলন বা lexicography চর্চা বিষয়ের মধ্যে পড়ে। চিন্তাধারার ইতিহাস এবং নৃতত্ত্ব বা সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব থাকে সঙ্গে। ভাষাবিজ্ঞানী এই দুটি ধারণার বিষয় নিজে চর্চা তো করে থাকেনই, তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক প্রণালীও রাখেন। যেটুকু দরকার তুলনা করার কাজে সেইটুকু জোগাড় করতে যতদূর তার বাইরে যেতে হয় ভাষাবিজ্ঞানী যান, তবে অবিলম্বে ফিরে আসেন ভাষার সামাজিক পরিধিতে। কোন্ দিকে গেলে কেমন করে বিভিন্নতা বা একতা বাড়ানো যেতে পারে তার সঙ্কেত পাওয়া যায় মাঝে মাঝে কোন বড় বিজ্ঞানী বা দার্শনিকের কাছে। গঠনতত্ত্ব ও শব্দার্থতত্ত্ব ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় সহায়তা করে, তবে ইন্দ্রিয়ভিত্তিক ভাষার কেন্দ্র বরাবরই প্রকৃতিসঙ্গত স্থিরীকৃত বিধি বা আধার।

বাস্তব কোন ঘটনার পরিচয় দেওয়া হয় না যখন বলা হয় ভাষা একটা প্রণালী। চর্চার পথ শুধু দেখিয়ে দেওয়া হয়। ভাষা একটি-মাত্র প্রণালী তো নয়। নানা গঠন ও শব্দার্থের প্রণালী দিয়ে শৃঙ্খলা-বিহীন শব্দ ও পদরাশি নিয়মের মধ্যে এনে বোধগম্য করা হয়। গঠন ও শব্দার্থ বলতে আজকাল বুঝতে হয় চালচলনে যা স্বীকৃত হয়।

গঠন প্রণালী সামাজিক ব্যবহারে সমর্থন পায় এবং শব্দার্থ ধরা পড়ে কথাবার্তায়। সমাজের আকার ও প্রসার তার যথার্থতাবিহীন নিশ্চয়তায়, তার শৃঙ্খলাবিহীন গঠনে এবং তার ভুলভ্রান্তিবহুল সংজ্ঞায়। তৃতীয় ধারণা অনুসারে যদি ভাষাকে প্রণালী বলতে হয় তাহলে এমন গুণ এই প্রণালীর ওপরে আরোপ করতে হয় যার গঠন শব্দার্থপ্রণালীর বিপরীত। এমন প্রণালী হবে বিধিহীন শব্দার্থ-গঠিত, অসঙ্গত এবং প্রতিলিপিবিহীন। ব্যক্তির ওপরে তাকে জোর করে চাপাতে হবে।

দর্শনশাস্ত্রের তত্ত্ব ভাষাভিত্তিক হতে পারে। তবে তিনটি স্বতন্ত্র অর্থে হবে। এক অর্থের সঙ্গে অন্য অর্থের মিল নেই। (১) গঠন-বিন্যাস সম্বন্ধে চর্চা করে দর্শন গণিত যুক্তিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, (২) শব্দার্থের বিন্যাস সম্বন্ধে চর্চা করে দর্শনতত্ত্ববিদ্যায় বা ontology-র অন্তর্ভুক্ত হতে পারে; (৩) সামাজিক চালচলন সম্বন্ধে চর্চা করে ইন্দ্রিয়ভিত্তিক বিজ্ঞান-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

কাজেই যখন দেখা যায় ভাষাভিত্তিক. দর্শনে নানা মুনির নানা মত তখন আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

ভাষার মূল্যায়ন

মূল্য অনুসারে বিভিন্ন ভাষার তুলনা করা যায় কি না এই বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানীদের নানা মত। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন না এটা সম্ভব। বিশ্বাস না করার যথার্থ কারণও আছে। ভাষার উৎকৃষ্টতা স্বীকার করলে কি জাতীয় শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা হয়? আর একটা কারণ এই যে আজপর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে ভাষার মূল্যায়ন করার প্রচেষ্টা সফল হয় নি। নানা কারণে একটা জাতি প্রাধান্য লাভ করতে পারে—রাজনৈতিক, সামরিক, ধর্মীয় বা বৈজ্ঞানিক বিদ্যা প্রয়োগের সফলতায়। কিন্তু নানা ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ যে জাতি করেছে তার ভাষা প্রাধান্য লাভ করার যোগ্য নাও হতে পারে। ভাষার তুলনামূলক গুণ নির্দেশ করতে হলে অন্য অনেক জটিল প্রশ্ন ওঠে। এমন সব প্রশ্ন ওঠে যে সহজেই মনে হতে পারে ভাষার মূল্যায়ন অর্থহীন বা বিপজ্জনক। কোনো বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষার মূল্যায়ন করা যায় কি না এখানে দেখতে চেষ্টা করব। ভাষাহিসাবে ভাষার মূল্য স্থির করতে গেলে অন্য সব কার্যক্ষেত্রের বিবেচনা বাদ দিতে হবে। এমন একটা পদ্ধতি খুঁজছি যা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কাজেই এখানে আলোচনা করা যাবে না কী পরিমাণে অবিকৃত সত্য কোনো এক ভাষার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়। যদিও বিচার করার এটা একটা ভালো পদ্ধতি। বাস্তবজগৎ একভাবে না একভাবে সাজানো গুছানো হয়ে থাকে প্রত্যেকটি ভাষাতে, তবে বিজ্ঞান যে জগৎ আমাদের দেখিয়ে আসছে সে

জগতের সঙ্গে সব বিষয়ে পরিচিত জগতের মিল নাও থাকতে পারে। পদার্থবিজ্ঞানীকে নিত্য নতুন শব্দ বানাতে হয় বা পুরনো শব্দ নতুন অর্থে ব্যবহার করতে হয়। জীববিজ্ঞানী নিত্য নতুন বিন্যাসপ্রণালী বের করে থাকেন। সমাজবিজ্ঞানীরা একটা অদ্ভুত নামকরণের জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। সব প্রণালী কিন্তু আংশিক ও অসম্পূর্ণ। ভাষার স্বাভাবিক নিয়মে ফেলতে যদি পারা যেত বৈজ্ঞানিকরা তবে খুশি হতেন। যদি বের করা যেত কোন ভাষায় বাস্তবজগৎ কতখানি প্রকাশ পেয়েছে এবং তার কতখানি মিল আছে বৈজ্ঞানিক জগতের সঙ্গে মাপতে পারা যেত তবে ভাষার মূল্যায়ন খানিকটা সহজ হয়ে উঠত। কিন্তু লোকে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক হিসাবে কথা বলে না। বহু রকম বিষয় নিয়ে কথাবার্তা চলে। তা ছাড়া নিত্য নতুন আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানের সত্য মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে এটা ভুললে চলবে না। সত্য আবিষ্কারের প্রণালী বৈজ্ঞানিকদের কাছে ভাষার চেয়ে বড়। তাঁদের ধ্যান ধারণাতে শব্দের স্থান আছে, তবে তাঁদের দৃষ্টি ভাষা ছাড়িয়ে যায়। তাঁদের চিন্তা, তাঁদের হিসাব, বিবেচনা, নজর, কল্পনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভাষাকে অতিক্রম করে। বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও ভাষা দুটি আলাদা বৃত্ত। একটার ওপরে অন্যটা পুরোপুরি ভাবে বসে না। কাজেই বৈজ্ঞানিকের ভাষাকে পরিভাষা বলা হয়। একাধিক পরিভাষা একাধিক প্রকৃত ভাষার সঙ্গে কী পরিমাণে মেলে দেখা যাবে। তবে বিজ্ঞানের ভাষার সঙ্গে প্রকৃত ভাষার সম্পর্কের ওপর ভাষার মূল্যায়ন করার পদ্ধতি নির্ভর করে না। কোনো প্রকৃত ভাষাকে সমগ্রভাবে দেখাতে গেলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কুলোবে না।

ভাষার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যিনি সর্বপ্রথম একটা নির্দিষ্ট নিয়ম বের করতে চেষ্টা করেন তাঁর নাম Frederick Von Schlegel। তাঁর মতে

শব্দের প্রাচুর্য ও বিচিত্রতা দেখে ভাষার মূল্যায়ন করা যায়। বহু আভিধানিক শব্দ এবং বহু ব্যাকরণের বিভাগ আছে পুরনো বা classical (ক্ল্যাসিকাল) ভাষায়। এই কারণে তিনি মনে করতেন আধুনিক ভাষার চেয়ে পুরনো ভাষা উন্নততর। শব্দের সংখ্যা বাড়াতে পারা যায় রূপবিন্যাস করে। পুরনো ভাষায় রূপবিন্যাস করার অনেক উপায় থাকে। Schlegel ও তাঁর বন্ধুরা এটা পছন্দ করতেন। নানা অ্যাফ্‌ফিক্স ক্রিয়াপদের সঙ্গে সংযোগ করলে ধাতুর সংখ্যা বেড়ে তো যায়ই, তবে যে-ভাষায় পদবিন্যাস হয় না ধাতুর সংখ্যা হয় ধাতুরূপের সমান। সংযোগ করা হয় সহকারী ক্রিয়াপদ, কাজেই মোট সংখ্যা কম হতে বাধ্য। বহুরকম শব্দরূপ তৈরী করা যায় বলেই Schlegel পদবিন্যাস পছন্দ করতেন।

এই মত যাঁরা পোষণ করেন তাঁদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি Dr Raghu Vira-র তৈরী Hindi-English Dictionary (১৯৫৮-সাল, দিল্লীতে)। তাঁর ধারণা ইংরেজী অভিধানে অন্তত পাঁচ লক্ষ শব্দ উল্লেখ করা আছে এবং হিন্দী অভিধানে তার আট ভাগের এক ভাগও নেই বলে হিন্দীর চেয়ে ইংরেজী ভাষার সম্পদ বেশী। তিনি মনে করেন যদি তিনি ইংরেজীর সমান বা কিছু বেশী সংখ্যক শব্দ বানিয়ে হিন্দী অভিধানে বসান তাহলে হিন্দী ইংরেজীর সমান মূল্যবান হয়ে উঠবে। যে সব শব্দ হিন্দী ভাষায় নেই অথচ থাকা দরকার বলে তিনি মনে করেন সেগুলি অবলীলাক্রমে বানিয়েছেন। ধাতু নিয়েছেন সংস্কৃত অভিধান থেকে এবং তার সঙ্গে সাফ্‌ফিক্স বা অ্যাফ্‌ফিক্স জুড়ে দিয়েছেন। হিন্দী ও সংস্কৃতের মধ্যে কোনো তফাৎ রাখার তো দরকার নেই। এই করে Dr. Raghu Vira আশা করেন জগতের চোখে হিন্দীর মান বাড়বে এবং তাকে উচ্চতর-মূল্যবান ভাষা বলে গণ্য করা হবে।

এর মধ্যে কোনো ভুল আছে কি ? বিপক্ষে কিছু বলার আছে। কয়েকটা অসুবিধা সহজে চোখে পড়ে। ফরাসী ভাষায় সর্বনামের দুটি কারক বা case। বিশেষ্যের একটা। জার্মান ভাষায় আছে চারটি। তাই বলে কি ফরাসী ভাষা জার্মান ভাষার চেয়ে কম উন্নত ? ফিন্‌ল্যাণ্ডের ভাষায় ১৬টা কারক। তার বেলায় ? অনেক অনগ্রসর জাতির ভাষায় শব্দের প্রাচুর্য দেখা যায়। যখন এটা আবিষ্কার করা হল তখন এই ভুল ধারণা গেল ভেঙে। যতদিন একটা ক্ল্যাসিকাল এবং একটি আধুনিক ভাষা ছাড়া আর কোনো ভাষা জানতে হত না ততদিন এই ধারণা পোষণ করা সম্ভব ছিল। এখন আর চলে না।

একটা ভাষা উন্নত এবং সমৃদ্ধ কিনা তার শব্দ সংখ্যা দেখে বুঝতে পারা যায় না। কাগজের টাকায় বহু ছবি আঁকা হয়ে থাকে। মুদ্রাস্ফীতির আগে এক টাকা দিয়ে যা পাওয়া যেত এখন ১০০ টাকা খরচ করলেও তা পাওয়া যায় না। মধ্যযুগের সংস্কৃতের কথা ধরা যাক। সেকালের অভিধানে শত শত শব্দ একই দ্রব্য বা বিষয়ের জন্য উল্লেখ করা আছে। মধ্যযুগের লেখক বেছে নিতে বাধ্য হতেন অনেক শব্দের মধ্যে থেকে যেগুলি তাঁর দরকার। এক এক শব্দের মূল অর্থে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা থাকে। সব সময় এই বিভিন্নতা বুঝে লেখক কি শব্দ ব্যবহার করেছেন ? বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মনে হয় তিনি স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ সুসজ্জিত শ্রেণীবদ্ধ করেছেন অর্থের কথা এতো না ভেবে। যে শব্দের বিশেষ বিশেষ অর্থ নেই তার কোনো বিশেষ মূল্যও নেই।

Schlegel-এর পরে Otto Jespersen ভাষার মূল্যায়নের পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করেন। তাঁর মত Schlegel-এর মতের বিপরীত। তিনি বলেন সব চেয়ে কম শব্দে সব চেয়ে বেশী প্রকাশ করার শক্তি যে ভাষার সেই ভাষা শ্রেষ্ঠ। তিনি দুটি গুণের ওপরে

জোর দিলেন। সহজ স্বাভাবিক ভাব এবং কার্যকারিতা। তাঁর কাছে এই দুটির গুরুত্ব বেশী। দৈনন্দিন ব্যবহারে এই দুটির সমতা থাকে না।

তিনি (Jespersen) ক্ল্যাসিক ভাষার তুলনায় আধুনিক ভাষাকে অধিক উন্নত মনে করতেন। ক্ল্যাসিক ভাষা অনেক রকম ব্যাকরণ-গঠিত কৌশলের ওপর নির্ভর করে। তিনি এই নির্ভরতাকে উন্নতির লক্ষণ মনে করতেন না। আর একজন গবেষক ১৯০৬ সালে একই মত অন্যভাবে প্রকাশ করেন। তাঁর নাম Herdan। তিনি বলেন যে ভাষার শব্দের মধ্যে যত কম সিল্যাবল ও phonemes থাকে সেই ভাষা তত উন্নত। তিনি মনে করেন এমন ভাষার কার্যকারিতা অধিক। ইংরেজী জার্মানের চেয়ে উন্নত এবং জার্মান রাশিয়ানের চেয়ে উন্নত এই কারণে। তিনি তাই মনে করেন।

Basic English গড়ে উঠল এই মত অনুযায়ী। Ogden মনে করতেন সাধারণভাবে যা প্রয়োজন তা বলা যায় ৮৫০টি শব্দে। অবশ্য বিশেষ বিষয়বস্তু নিয়ে আলাপ করতে হলে আরো শব্দ নিশ্চয় লাগে। কিন্তু শব্দ সংখ্যা কম রাখলে কথা মনে রাখা এবং ইংরেজী শেখাও সহজ। আগে Basic English শিখতে হয়, তার পরে non-Basic। এই ছিল Ogden-এর পরিকল্পনা এবং এই করতে গিয়ে ভাষাটাকে খুব পরিপাটি ভাবে সাজানো হল। তার কার্যকারিতাও অনেক বেড়ে গেল। দেখা যাক এর ফল কী ?

এই দ্বিতীয় মত প্রথম মতের ঠিক উল্টো, কোনো সন্দেহ নেই। Tagalog-এ স্বরবর্ণের প্রাচুর্য ফরাসীর চেয়ে বেশী বলে Tagalog কি ফরাসীর চেয়ে উন্নত ? রাশিয়ানে পদের বিন্যাস অনেক বেশী বলে কি হিন্দী তার থেকে উন্নত ? ১২,৪২৫টি শব্দার্থ আছে Basic-এ। ৮৫০টি শব্দে কি এই ১২,৪২৫ শব্দার্থের সব বোঝানো যাবে ? ৪০০০

শব্দ ব্যবহার করতে পারলে কি বেশী সুবিধা হত না? যদি শব্দ সংখ্যা কম রাখা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে ক্রিয়াপদ বাদ দেওয়া হয়েছে কেন? এক এক ক্রিয়াপদের অর্থ গড়ে ৫০টা। বিশেষ্যকে রাখা হয়েছে অথচ এক একটা বিশেষ্যের অর্থ গড়ে ১২টা। এক একটা শব্দের অর্থ প্রকাশ করা হয় কি তার syllable ও phoneme কত দেখে? শব্দের রূপ ও মানে কি সমান? শব্দের রূপ ও অর্থের মধ্যে যে সম্পর্ক তাকে আধিক্য বা redundancy বলা হয়। প্রথম মত অনুসারে রূপের আধিক্য দেখে ভাষার মূল্য বিচার করা হয়, দ্বিতীয় মত অনুসারে রূপের অনাধিক্য দেখে। তবে কথা বলার সময় রূপের আধিক্য ও অনাধিক্যের মধ্যে একটা সমতা থাকা দরকার।

সমস্যা অনেকটা এই: শব্দ ও শব্দসমষ্টির মধ্যে বেছে নিতে হবে। Word-codedness না phrase codability? কোন্‌টা চাই? শব্দসমষ্টির মধ্যে কয়েকটা শব্দের অর্থ এক হয়ে যায় এবং বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। যেমন "bush" মানে "a small leafy tree"। Bush একটা শব্দ। A small leafy tree একটি শব্দসমষ্টি। Small-এর অর্থ এখানে "small child"-এ যা তা নয়। Leafy-র অর্থ এখানে leafy vegetable-এর বেলায় যা তা নয়। Tree-র অর্থ এখানে young tree বা big tree নয়। সমষ্টির অন্তর্গত হবার ফলে এই শব্দগুলির অর্থ একটু বদ্‌লেছে। কতটা বদ্‌লেছে হঠাৎ চোখে নাও পড়তে পারে। তবু বদ্‌লেছে। শব্দসমষ্টি ঠিক ব্যবহার করতে পারা যাবে না যদি এটা না বুঝি। সমষ্টির অন্তর্গত শব্দগুলির স্বতন্ত্র অর্থের কথা ভাবতে না হয় যদি সমষ্টির জায়গায় একটিমাত্র শব্দ বসানো হয়। এতে আমাদের পক্ষে মনে রাখারও সুবিধা। অর্থ বদ্‌লে যায় না, অর্থের রূপান্তর মনকে বিভ্রান্ত করে না। এমন হতে পারে যে

bush বললে বোঝাবে small leafy tree। বা tree বললে একটা big, not so leafy, bush। Brown ও Lenneberg পরীক্ষা করে দেখেছেন রং চেন্‌বার সময় কী হয়। যে রঙের নাম একটিমাত্র শব্দ সেই রং চিনতে দেরী হয় না এবং প্রায় সকলেই একরকম দেখে। নামে যদি একাধিক শব্দ থাকে অর্থাৎ যদি শব্দসমষ্টি হয়. তাহলে রং চিনতে সময় লাগে। যদি কোনো বিশেষ সমাজ বা পরিবেশে কোনো ক্ষুদ্র গাছকে চিনে রাখার দরকার হয় তা হলে গাছটির জন্য আলাদা একটা নামকরণ হলে সুবিধা হয়। এবং সেই নাম যদি একটিমাত্র শব্দ হয় মনে রাখা ও ব্যবহার করা সহজ হয়। শব্দ-সমষ্টির সুবিধা তার স্পষ্টতর অর্থ। তার অর্থপ্রকাশের শক্তি বেশী হলেও অসুবিধা হয় মনে রাখতে। আর একটা অসুবিধা হচ্ছে তার অর্থ বুঝে নিতে হয়। বোঝবার সীমা আছে। মনে রাখারও সীমা আছে। স্মরণশক্তি বা বোঝবার শক্তির ওপরে অতিরিক্ত চাপ দেওয়া উচিত নয়। দুটির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখা চাই।

শব্দের সংখ্যা এবং রূপের প্রাচুয বা অপ্রাচুর্য দেখে যদি ভাষার মূল্যায়ন না করা যায় তবে আমরা আর একটা প্রশ্ন তুলতে পারি। অর্থের প্রাচুয বা অপ্রাচুর্য দিয়ে ভাষার মূল্যায়ন করা যায় কি না? অবশ্য বাস্তব জগতে অর্থ নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। আমাদের দেখতে হয় কেবল যেসব বস্তুর কথা লোকে সাধারণ ভাবে বলে থাকে।

একটি খুব প্রাচীন অথচ চির নতুন ধারণা আছে ভাষার সম্বন্ধে। ভাষার মূল্যায়ন করা হয় কী দেখে? তার শব্দ ও শব্দসমষ্টির অর্থ অন্য কোনো ভাষায় প্রকাশ করা যায় কি যায় না, তার শব্দগুলি অদ্বিতীয় কি না, কোনো বিশেষ অর্থ প্রকাশের একমাত্র উপায় কি না, অনুবাদ বা বর্ণনা করা যায় কি না? শব্দসমষ্টির বেলায়ও তাই। এক

একটি শব্দের মানে বোঝাতে আস্ত এক একটা বই লেখা যায়, তবু বিচার শেষ করা যায় না। এই ধরনের শব্দ কী কী? ধর্ম / রস / logose / arete / tao / এই ধরনের শব্দের সাহায্যে অনেক কিছু বোঝাতে হয় অথচ এদের অর্থ বোঝাতে পারা যায় না সহজে। এই ধরনের শব্দকে বলা হয় instruments of intelligibility—অর্থাৎ বোধগম্যতার উপায়। এই রকম শব্দের সংখ্যা কত দেখে কি ভাষার মূল্যায়ন করা যায় না? শব্দগুলির নিজস্ব মূল্য তো আছেই। ভাষার প্রকাশ করার শক্তি কি বৃদ্ধি পায় না এগুলি আছে বলে? তার মহিমা বাড়ে নিশ্চয়।

অনেকটা এই ধরনের মত ব্যক্ত করেছেন Wilhelm von Humboldt একটি বিখ্যাত ভূমিকায়। তাঁর কাছে ভাষা মানব মনের অস্থায়ী একটা প্রকাশের উপায় মাত্র। এই তার মূল্য। মানব মন একটার পর একটা মূল্যমান সৃষ্টি করতে থাকে। সেই সৃষ্টি আংশিক হতে পারে, তবু তা মূল্যবান। ভাষার ইতিহাসে ভাষার বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় প্রত্যেকটি পদক্ষেপে। একটা উৎকৃষ্ট ভাষার কাঠামো বা আদর্শের ছাঁচ পেলে তাকে দিয়ে মানদণ্ডের কাজ করা যায়। তার সঙ্গে তুলনা করে ভাষার মূল্যায়ন করা সম্ভব। কোনো একটা ভাষার অবনতি বা উন্নতি মাপতে পারা যাবে। হয়ত দেখা যাবে ভাষাটা পরিবর্তনের পথে। বিচার করে বলা সম্ভব হবে কোনো এক ভাষা অন্য ভাষার চেয়ে উন্নত কি না বা কতখানি উন্নত। আদর্শ কাঠামোর মানদণ্ডে ভাষার গুণ এবং বৈচিত্র্য দেখতে হয়। গুণ কত এবং কী কী? বৈচিত্র্য কত এবং কী কী? অনেক মূল্যবান গুণ একত্র হলে ভাষা উন্নত হয়।

ভাষা সম্বন্ধে আর একটা ধারণা অবলম্বন করতে হয় এই মত খণ্ডন করতে হলে। এই ধারণা আমরা পাই ক্ল্যাসিকাল ভাষা

থেকে। ভাষার মূল্য নির্ণয় করতে হলে কী করতে হবে? তার শব্দ ও শব্দসমষ্টির অর্থ এমন একটা অঙ্কের ছাঁচের মধ্যে সাজাতে হবে যাতে একটার থেকে অন্যটার অর্থ উৎপাদন বা অনুমান করা যায়ঃ একটা calculus of meanings, শব্দার্থের গণিত, যার মধ্যে শব্দ এবং শব্দসমষ্টির অর্থের যোগাযোগ থাকে। এই রকম গণিতে তিনটে তালিকা থাকবে। একটি হবে রূপের তালিকা, একটি রূপপরিবর্তনের উপায়ের তালিকা এবং একটি মূল পদের বা মূল শব্দার্থের। মূল পদ বা মূল ধাতুর সংখ্যা খুব বেশী হবে না ধরে নেওয়া যাক। প্রত্যেকটি হবে অর্থের একটি অবিভাজ্য অংশ। রূপের তালিকায় প্রিফিক্‌স্ বা অ্যাফ্‌ফিক্‌সের সংযোগে নিত্য নতুন শব্দ তৈরী হতে থাকবে ধাতু থেকে। বাঁধা নিয়ম অনুসারে এইসব নতুন শব্দ মূল পদের অর্থ একটু একটু করে বাড়াতে থাকবে, কমাতে থাকবে বা অন্য রকমে বদলাতে থাকবে। রূপপরিবর্তনের উপায়ের তালিকায় সহকারী ক্রিয়াপদের ব্যবহারে কীভাবে নিয়ম অনুসারে বিন্যাস হয় উল্লেখ করা থাকবে। সংস্কৃত ধাতু 'kr' 'dhr' এর সঙ্গে 'kta' সংযোগ যেমন 'krta' ও 'dhrta'। সংস্কৃতে যে কোনো শব্দার্থ সহজে পাওয়া যেতে পারে এই তিনটি তালিকার সাহায্যে যদি মিলিয়ে দেখা হয়। সংস্কৃত যে উন্নত ভাষা এই যুক্তি দিয়ে দেখানো যায়।

একটা তত্ত্ব গুছিয়ে লেখা হলে তার সুবিধা অসুবিধা চোখে পড়ে। সংস্কৃতে বেশীর ভাগ শব্দ ধাতু থেকে নেওয়া হয়েছে, তবে একাধিক শব্দে ধাতুর উপস্থিতি দেখানো হয়নি। এই ভাবে অঙ্কের ছাঁচ বাড়ানো আপত্তিকর দুই কারণে। কাজে লাগাতে হলে অঙ্কে সীমিত সংখ্যক উপায় ও বিষয় রাখা দরকার। যে অঙ্ক কেবলই বেড়ে যায় তাকে দিয়ে কাজ হয় না। আপত্তিকর হবার দ্বিতীয় কারণ এই ধাতু বা মূল পদ বৈজ্ঞানিক বিষয়ের মতন নয়। যে ভাষা কেউ কোনো

দিন বলেনি সে আবার কেমন ভাষা? যেসব অর্থ প্রকাশ করতে কেউ কোনো দিন চেষ্টা করেনি সেই বা কি রকম? এই করে ভাষাবিদেরা কল্পিত একটি পদ্ধতি বা methodical fictionকে বাস্তবে পরিণত করতে চেষ্টা করেছেন। ভাববাদী বা metaphysical বাস্তব।

ভাষার মূল্যায়ন করা যায় না ধাতুর সংখ্যা বা অর্থ বা রূপান্তরের উপায় দেখে। আপাতত মনে করি তাই। ভাষার মূল্য তার প্রাচুর্যের মধ্যে নেই। তার economy বা সীমাবদ্ধতার মধ্যে নেই। তার প্রকাশ করার শক্তির মধ্যে নেই। তার সংযোজন ক্ষমতার মধ্যে নেই। অর্থের বাহন হিসাবে ভাষার মূল্যায়ন করা যায় কি না দেখা যাক। কত সহজে পরস্পরকে লোকে বোঝে? আপন ভাষা বলার সময়? পরের ভাষা বলার সময়? প্রথম প্রশ্ন পুনরুক্তির মত শোনায়। দ্বিতীয় প্রশ্ন মনে হয় বিপরীত। তবে বোঝাপড়ার যুক্তি খুবই মজার।

ভাষা কোন অর্থে ভাষা হয়? এমন ভাষা জানা নেই যার গঠন বা রূপ অপরিবর্তনীয়। এমন ভাষা জানা নেই যার রূপের প্রণালী স্বতন্ত্র, দৃঢ়, সঙ্গত বা যার দ্বারা একটি স্বতন্ত্র, দৃঢ়, সঙ্গত অর্থের প্রণালী প্রকাশ পায়। এক একটি সমাজে হয়ত কিছুটা সময়ের জন্য মনে হতে পারে ভাষাটা এই রকম হয়েছে। কিন্তু যে সমাজে এটা হয় সে সমাজ নেহাৎ ছোটো—একই মনোভাবে মগ্ন—একরকম নিরক্ষর। এই সমাজ ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক কারণে বিচ্ছিন্ন। আমরা দূর থেকে দেখি বলে এদের ভাষাকে সঙ্গত এবং অপরিবর্তনশীল মনে হয়। যতগুলো ভাষা আমরা ভালো করে জানি এবং যেসব ভাষা নিয়ে ব্যাপকভাবে চর্চা হয়েছে প্রত্যেকটা এক একটা প্রকাণ্ড মেঘের মতন। সেই মেঘের মধ্যে বহু উপভাষা বা পরিভাষা। এক একটি

পরিভাষা গড়ে ওঠে জাত বা শ্রেণী বা পদ বা বয়স বা পেশাকে কেন্দ্র করে। দ্বৈভাষিক তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকেন। এক একটি ভাষা যত আমরা দেখি তত মনে হবে শেষপর্যন্ত আমরা খুব কমই জানি। শব্দার্থে কত রকম রং খেলে। রূপ ও প্রণালী কীভাবে চোখের সামনে পরিবর্তিত হয়। মোট কথা ভাষাকে ভাষা হিসাবে স্বীকার করা এবং তার মূল্য নির্ণয় করার পক্ষে সামাজিক অবস্থা অবলম্বন যুক্তিসঙ্গত নয়।

ভাষার সীমানা ছাড়িয়ে যায় মানুষের কথাবার্তা। অনেক কিছু আলোচনা করা হয় দৈনন্দিন জীবনে। রূপের রকম এবং শব্দার্থের সমষ্টি বদ্‌লে বদ্‌লে যায়। আণবিক বোমা নিয়ে কথা হয়। ভূত প্রেত নিয়েও কথা হয়। ফরাসীরা বৌদ্ধধর্মের কথা ভাবে ও বলে। বাঙালীরা বলে tragedy-র কথা। তীর ধনুক এবং radar প্রায় সমান ভাবে আলোচিত হয়। বিশ্বাস থাক আর না থাক, ব্যবহার করার শক্তি থাক বা না থাক, আজকাল নিরক্ষর চাষী থেকে কলেজের প্রফেসর পর্যন্ত সকলেরই বহু রকম জিনিষ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। এক এক সমাজে এক এক বিশেষ বিষয় জানার দরকার থাকতে পারে, তবে তার ওপরে ভাষার স্বীকৃতি নির্ভর করে না।

ভাষার স্বীকৃতির জন্য জাতির স্বীকৃতি দরকার। যারা পাশাপাশি থাকে ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক কারণে তারা এক সময় সচেতন হয়ে বুঝতে পারে তাদের মধ্যে মিল এতো বেশী যে অন্য সব জাতির থেকে তারা স্বতন্ত্র। তাদের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগে। তাদের চাল-চলনে, চিন্তাধারায়, ভাবভঙ্গীতে একটা বৈশিষ্ট্য এসে যায়। বিশেষ কোনো ভাষায় কথাবার্তা চললে সকলেই সচেতন হয়ে ওঠে। শিশু, বৃদ্ধ বা নিরক্ষর ব্যক্তি ছাড়া। ঐতিহাসিকরা বলতে পারেন কী কী অবস্থাতে একটা জাতি তার নিজস্ব স্বতন্ত্রতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে

ওঠে। আমাদের কাজ হবে নির্ণয় করে দেখা জাতিহিসাবে স্বীকৃতির সঙ্গে ভাষার স্বীকৃতির সম্পর্কটা কী।

জাতিহিসাবে স্বীকৃতি না হলে চলে না, তবে ভাষার স্বীকৃতির জন্য আরো কিছু দরকার। নির্ণয় করে যা পাওয়া যায় তা ফাঁকা কার্যপ্রণালী মাত্র। দেখে নিতে হয় ভাষার মধ্যে কী কী আছে অর্থের দিক থেকে ও রূপের দিক থেকে। Czech ভাষায় chevron ব্যবহার হয়। Chevron একটা চিহ্ন। এই ধরণের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের মনের মধ্যে স্পষ্ট একটা ছবি গড়ে ওঠে। এই ছবি স্থায়ী নাও হতে পারে। নিখুঁতও নয় হয়ত। তবে ভাষাকে একটা বাস্তব রূপ দেয়। যুক্তিসঙ্গতভাবে বলতে হয় ভাষা একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সব সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মত তার যথার্থ রূপ স্থির করতে হয় তার অন্তর্গত প্রণালীর অর্থরূপের আবশ্যকতা বুঝে। যে অর্থে একটি প্রাণী বা দ্রব্য বা শব্দার্থ স্থিতি পায় সেই অর্থে কোনো ভাষা স্থিতি পায় না। একটি সমাজ তার নিজস্ব ও স্বতন্ত্র রূপ কী ভাবে প্রকাশ করে, তার সাংস্কৃতিক জীবনে যত্নের সঙ্গে তুলে রাখে, না বর্জন করে—সবই তার ভাষায় ধরা পড়ে, ভাষাতে তার হদিস পাই। মোট কথা ভাষা অর্ধেক স্বপ্ন অর্ধেক বাস্তব। তার অবস্থান কর্মজীবন এবং আদর্শ জীবনের মাঝামাঝি বা শুধু সামাজিক আবশ্যকতায়।

অতএব ভাষার মূল্য স্থির করার একমাত্র উপায় সামাজিক প্রয়োজনে তার সফলতা বা নিষ্ফলতা। সফল হলে ভাষা বন্ধ বা closed হয়ে যায়। নিষ্ফল হলে ভাষা খোলা বা open থাকে। এই দুটি বিষয়ের ওপরে ভাষার মূল্য কী ভাবে নির্ভর করে এখন বুঝতে চেষ্টা করব। ভাষা বন্ধ হবে অথচ খোলাও থাকবে। এই দুটি দিকে ভাষার প্রসার, যদিও দিক দুটি বিপরীত। বিপরীত হলেও বিরোধী

ভাব নেই। ভাষা বন্ধ হলে তার রূপবিন্যাসে একটা সাম্য এসে যায়। এটা একটা লাভ। রূপবিন্যাসবিষ্ঠায় সফল হওয়া সহজ হয়, তবে উচ্চারণপ্রণালী কঠিন হয়ে ওঠে। পদযোজনা হয় সহজ, তবে স্টাইল (style) বা রীতি তার তুলনায় কঠিন। তা সত্ত্বেও একটা standard এসে যায় ভাষার ব্যবহারে। এই ধরনের uniformity কি রকম হয়? তার কার্যক্ষেত্র অসীম। তাতে গোটা জাতি অংশভাগী। ফলে তার প্রয়োগ বিস্তারিত। তবে সকলের সমর্থন থাকলেও কাজের বেলায় দেখা যায় অল্পসংখ্যক লোক বরাবর থাকে যাদের মতে অন্য সবাই সায় দেয় এবং যাদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। এই অল্পসংখ্যক লোক সমাজের গুণীজ্ঞানী জন। তাঁদের অনুকরণে লাভ আছে। এঁরা দিক দেখান। দিক ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে একটা সমতা বা standard রাখা দরকার। দিক এবং বিস্তার যত স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভাষার বন্ধতা হয় তত প্রখর। বন্ধ হলে ভাষা নানাভাবে লাভবান হয়, কাজেই তার মূল্যও বাড়ে।

একটা standard বা সাম্য অবস্থা তৈরীর জন্য তিনটি জিনিস প্রয়োজন। Space, time ও vocation অর্থাৎ স্থান কাল পেশা। বাংলা ভাষার বিস্তার বাংলা দেশে। কাল বলতে বুঝতে হবে চৌদ্দ শতাব্দীর পর থেকে আজ পর্য্যন্ত। পেশা বলতে মানবজীবনের প্রায় সব সাধারণ কর্ম, কয়েকটা বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া। এই সব ক্ষেত্র কী কী? Law, Government, Administration, Big Business, Science, Industry বাংলার দিক নির্ণয় করা হয় South Central Bengal অর্থাৎ দক্ষিণ বাংলার মধ্য ভাগে। কাল হচ্ছে ১৪শ, ১৬শ, মধ্য ১৯শ, মধ্য ২০শ শতাব্দী। যে অল্পসংখ্যক গুণী-জ্ঞানী নেতৃত্ব করেন তাঁরা humanist, মানবধর্মে বিশ্বাসী, সংস্কৃত ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্য পড়েন। এখানে উল্লেখ করা ভালো যে ভাষার বিস্তারে এবং দিকে

ছেদ পড়তে পারে। তাই যদি ঘটে ভাষা হয়ে ওঠে একটা hierarchically ordered manifold, অর্থাৎ বহুপ্রকার স্তরে স্তরে সাজানো একটা সৌধ। নয়াদিল্লীতে কয়েক হাজার বাঙালী থাকে। তাদের বিস্তার সীমাবদ্ধ। পশ্চিমবাংলায় বা বাংলাদেশে যারা আছে তাদের বিস্তার মুখ্য। ১৬শ শতাব্দীতে যে দিক দেখানো হয়েছিল সেটা গৌণ। মধ্য ১৯শ শতাব্দীতে যে দিক দেখানো হয়েছিল সেটা মুখ্য। ভাষা সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে চর্চা করতে হলে স্থান কাল পেশা বিস্তার ও দিক দেখতে হবে ভাষার পরিসরের মধ্যে। তা হলে ভাষার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে।

আর একটা কারণে closure বা বদ্ধতায় লাভ আছে। একটা সমতা বা standard থাকলে জাতির বিভিন্ন শ্রেণী ও ভাগের মধ্যে কথাবার্তা সহজ হয়। সবাই সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারে। অর্থ-বিন্যাসের মধ্যে সমতা আসে যখন ভাষার আদর্শের একটা ছাঁচ সকলে গ্রহণ করে। শব্দবিন্যাস ও রূপবিন্যাসেও তা থাকবে। যেখানে উপভাষা বা পরিভাষার ব্যবহার হয় সেখানে ভাষা সম্পূর্ণ বদ্ধ হয় না। বাংলাও হয়নি। ভাষার সমতা লাভ হলে রূপ ও বিন্যাসের মধ্যে একতা বা সাম্য ভাব থাকবে এবং তার সঙ্গে অর্থের একটা সামঞ্জস্য থাকবে। এর ফলে চালচলনে নৈপুণ্য আসে, তবে দর্শন-চর্চায় নৈপুণ্য আনা কঠিন। আইনবিদ্যায় সাম্যভাব আসে। বিজ্ঞানে আসে না। আর্টে বা শিল্পে যে পরিমাণে সমতা থাকে, বিজ্ঞানে তা থাকে না। তবে একটা সাধনা দেখা দেয়। শব্দব্যবহারে সমতা আনার চেষ্টা থাকে। কথা বলার রীতি একই রকম হয়ে ওঠে। এইটুকু বললে চলবে এখানে, ভাষা বদ্ধ হলে সমতা ও একতা লাভ হয়। ভাষার মূল্য বাড়ে।

ভাষা খোলা থাকলেও লাভ আছে। পরিবর্তনের পথ খোলা

থাকে এবং পরিবর্তন করার পদ্ধতিতে একটা সাম্যভাব আসে। কাছাকাছি বা নিকটস্থ ভাষার সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ে। শব্দ, রূপ ও অর্থের বিনিময় হয়। প্রথমে মনে হতে পারে ভাষার মূল্য কমে এর ফলে। ভাষা যদি বদ্‌লে যেতে থাকে বা অন্য ভাষার প্রয়োজনানুরূপে গড়ে ওঠে তা হলে স্থায়িত্ব আসবে না। মূল্য কমে বাড়ে। কী ভাবে পরিবর্তন নিয়মানুসারে স্থির করা যায় এবং অন্য ভাষা থেকে কী ভাবে শব্দ বা বিন্যাস পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়? ভাষার মূল্যায়ন করার এটা একটা উপায়।

নতুনকে গ্রহণ করার বেলায় প্রথম কথা এই ° ভাষা সমতা লাভ করলে বা standardised হলে নতুন নতুন শব্দ বা শব্দসমষ্টি গ্রহণ বা বানানো একটা বিশেষ নিয়মানুসারে করতে হয়। Bohuslav Havránek-এর মত এই। নতুন নতুন অর্থ গ্রহণ বা বানানো কিন্তু নিয়মানুসারে না হলে চলবে না। অর্থ বিন্যাস, ব্যাখ্যা, সংজ্ঞা—এই সবের পদ্ধতি বৃদ্ধি লাভ করবে এবং সংশোধিতও হবে। নূতনত্ব আসে শব্দবিন্যাস পদ্ধতিতে, অর্থে নূতনত্বের বাহন হয়ে। নূতনত্ব গ্রহণ করার শক্তি কতখানি যদি মাপতে হয়, দেখতে হবে আদি অর্থসমষ্টির সঙ্গে কতটা নতুন অর্থ ভাষায় আমদানি হয় বছরে বছরে। একে বলা হয় accomodation বা জায়গা দেওয়া।

তার পরে আসে assimilation। সব রকম বিষয় নিয়ে কথা বলা হয় যা কোনো একটা ভাষায়। এটা বুঝতে কষ্ট হয় না। এবং কোনো সমাজ স্বয়ং-পর্যাপ্ত নয় কথা বলার প্রসঙ্গে। সব সমাজের স্বার্থ জড়িত এমন কোনো ব্যাপার যখন আছে তখন অধিকাংশ সমাজ বাইরে থেকে নির্দেশ নেয়। একজন ইংরেজের অবস্থা ধরে নেওয়া যাক। যতক্ষণ আন্তর্জাতিক কোনো ব্যাপারে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সে যোগ না দেয় ততক্ষণ ইংরেজী ছাড়া কোনো

ভাষা শেখার তার প্রয়োজন নেই। তবে যোগ দেওয়া মাত্র সে ফরাসী জার্মান স্প্যানিশ জানতে বাধ্য। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ল্যাটিন গ্রীক ফরাসী জার্মান লাগে। ধর্মের বেলায় ল্যাটিন গ্রীক ও হিব্রু। ব্যবসায় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহু ভাষা দরকার।

দুটি ভাষার মধ্যে যদি রূপ ও অর্থের বিন্যাসে কিছু মিল থাকে তাহলে নিশ্চয় সুবিধা হবে শিখতে। ভাষায় ভাষায় অনুকরণ হয়ে থাকে। বিনিময় বহুরকম হয়। আধুনিক Hebrew-র বেলায় দেখা যায় তার phonology পূর্ব ইউরোপের সাধারণ নিবাসীর মতন এবং সাফ্‌ফিক্স ও প্রিফিক্স ইউরোপীয় ভাষার ছাঁচে। হিন্দী যার ভাষা তার পক্ষে সংস্কৃত শেখা সহজ, কেননা সংস্কৃত থেকে আভিধানিক শব্দ বহু নেওয়া হয়েছে। সংস্কৃত যার ভিত্তি এমন কোনো ভাষা শেখা তার পক্ষে কঠিন হবে না, যেমন গুজরাটী, মারাঠী ইত্যাদি।

সাদৃশীকরণ পদযোজনার বেলা একই রকম হয়। অর্থযোজনার বেলাও তাই। পুরনো শব্দ কেমন করে নতুন অর্থে ব্যবহার করতে হয় ও কেমন করে অর্থের বিস্তার বেড়ে যায় তা ঐতিহাসিকেরা, ভাষাবিদেরা, নৃতত্ত্ববিদেরা ও অনুবাদকেরা আমাদের দেখিয়েছেন। নতুন নতুন সম্পর্ক স্থাপন হয়। ইউরোপীয় ভাষাদের মধ্যে এতো মিল দেখলেন Benjamin Lee Whorf যে তিনি সব ক'টাকে Standard Average European বললেন। এই ধরনের মিলকে বলা হয় language association বা ভাষাসমষ্টি। Becker আবার কোনো কোনো ভাষাকে teacher language বা গুরু ভাষা বলেন। সব ভাষারই গুরু নিশ্চয় থাকে এবং একটি কি দুটি প্রধান হয়। ইংরেজীর দুটি গুরু। ফরাসী এবং ল্যাটিন। আধুনিক ভারতীয় ভাষারও দুটি গুরু—ইংরেজী ও সংস্কৃত। নিজের ভাষার সঙ্গে যে ভাষার মিল আছে সেই ভাষা শিক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। বিশেষ করে যখন

ভাষায় নতুন গ্রহণের শক্তি বা accomodation কম থাকে এবং accomodation যা আছে তা অন্যান্য ভাষা থেকে আলাদা রকমের হয়।

Havránek যাকে intellectualisation বলেন এটা কিন্তু তা নয়। Havránek বলেন বিজ্ঞান, আইন ও শিল্প-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ একটা প্রণালীর রূপ থাকবে। পদযোজনার প্রণালীতেও মিল থাকবে। এটা সম্ভব যেখানে এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন অল্পসংখ্যক লোক। তাঁরা জনসাধারণকে শিক্ষা দেন এবং অন্য সমাজের জ্ঞানী গুণীদের সঙ্গে কথা বলেন। Havránek মনে করতেন ভাষা বন্ধ থাকলে লাভ বেশী হয়। তিনি সাদৃশীকরণের শক্তিও চান বেশী করে।

অতএব দেখা যাচ্ছে ভাষার মূল্য দুটি দিক থেকে নির্ণয় করা যায়। বন্ধ থাকার দিক থেকে এবং খোলা থাকার দিক থেকে। বন্ধ হলে থাকবে পদযোজনার মিল ও অর্থের একতা। খোলা হলে থাকবে অর্থের সাদৃশীকরণ ও গ্রহণ।

Vilém Mathesius যাকে বলেন flexible stability তার সঙ্গে এর পুরোপুরি মিল নেই। ভাষার মূল্য কোথায়? দেখা যাচ্ছে ভাষার মূল্য আত্মজ্ঞানবিশিষ্টতায় এবং এই জ্ঞানাতীত গুণ কী পরিমাণে অবলম্বন করা হয় তার ওপর।

শব্দার্থের প্রকৃত রূপ

ভাষা শেখার সময় ব্যাকরণের চেয়ে অভিধান বেশী কাজে লাগে। এবং যে ব্যাকরণে কেবল নিয়ম উল্লেখ করা আছে তার চেয়ে বেশী কাজে লাগে যে ব্যাকরণ উল্লেখ করে শব্দ কী ভাবে নির্বাচন এবং প্রয়োগ করা হয় একাধিক অর্থে। তবু Leonard Bloomfield-এর মতন ভাষাবিজ্ঞানী বলেন শব্দ বা পদরূপ কী অবস্থাতে ব্যবহার হয় এবং তার প্রতিক্রিয়া কী না জানলে তার অর্থ ভালো করে বোঝা যায় না। যে শোনে সে কী রকম সাড়া দেয়? সব অবস্থাতে মানুষ কথা বলে ও সাড়া দেয়। অবস্থা ও সাড়ার সঙ্গে জগতের সামগ্রী জড়িত। অথচ জগতের সামগ্রী বুঝতে হলে যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দরকার সাধারণ মানুষের তা নেই। যা জানা সম্ভব বা উচিত তার খুব সামান্য অংশ সে জানে। এই কারণে Bloomfield বলেন শব্দ বা পদের অর্থভেদ ভাষাতত্ত্বের সবচেয়ে অবহেলিত ক্ষেত্র। এর তাৎপর্য সহজে অনুমান করা যায়।

যা জানার প্রয়োজন বেশী তা ভাষাতত্ত্বে অবহেলিত। দুঃখের কথা ঠিকই, তবে জগতের সামগ্রীর কোনো সীমা নেই; জগৎ অপরিমিত। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেরও কোনো সীমা নেই। শব্দার্থ চর্চা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রাখতে হবে, যদি অবহেলার ওপরে এতো জোর দেওয়া হয়। ভাষাতত্ত্বে শব্দার্থ অবহেলিত এটা স্ফোটনশীল একটা ধারণা।

দুটি জিনিসের মধ্যে Bloomfield গোলমাল করে ফেলেছেন।

সেই দুটি এই ঃ বিনা প্রমাণে যা স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং যা কিছু এখনও অনাবিষ্কৃত। অসীমের সঙ্গে যা কিছু বড় তাও গোলমাল করে ফেলেছেন। হয়ত তিনি মনে করলেন বস্তু বা দ্রব্যের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে অসীমে এসে ঠেকবে। অসীমের মধ্যে শব্দার্থের একটা নির্দিষ্ট রূপ দেওয়া যায় না, দেবতার দয়া না হলে। Bloomfield-এর পরে যাঁরা গবেষণা করতে এলেন তাঁরা এটা না দেখে পারলেন না। দেবতার দয়া না হলে কোনো অর্থের এতটুকু আভাস পাওয়া যাবে না। Bloomfield এটা বোঝেননি। শব্দার্থ চর্চা কোনো স্থান পাবে না ভাষাতত্ত্বে যদি এটা স্বীকার না করা হয়। শব্দ বা পদের অর্থ এখন যা তাই থেকে যাবে একটা ভোঁতা ও মোটা উপায় বা কৌশলমাত্র।

বাস্তব অভিজ্ঞতা ও শৃঙ্খলাসঙ্গত পদ্ধতির মধ্যে এই মিলের অভাব থাকা সত্ত্বেও এর সম্বন্ধে সকলেই নীরব। কেউ যদি এই দিকে পা বাড়ায় সে নিষ্ফল হয়ে অবিলম্বে হটে আসে। ভাষাবিজ্ঞানী খুশি মনে নানা ভাষা শিখতে থাকেন, বলতে থাকেন, তর্জমা করতে থাকেন এবং টীকা রচনা করতে থাকেন। যাঁরা অভিধান বানান বা ব্যাকরণের সংজ্ঞা লেখেন তাঁদের মতন ভাষাবিজ্ঞানী কাজ করে যান। যাঁরা ভাষাবিজ্ঞানী নন তাঁরা নির্ভয়ে শব্দ বা পদের অর্থ বর্ণনা ও বিচার করতে থাকেন। তাঁদের কোনো দ্বিধা নেই। শব্দ বা পদের মানে ভালো ভাবে বা চলনসই ভাবে বা অল্পবিস্তর ভাবে বা দরকারী কি অদরকারী ভাবে বোঝানো হয়েছে কিনা তাঁরা দেখেন না। ভাষাবিজ্ঞানী এই রকম করতে পারেন না। তিনি বাধ্য তাঁর মতামতের হেতু দিতে। তাঁর চিন্তাধারা মার্জিত ও সভ্য করে রাখা তাঁর একটা কর্তব্য। তিনি বিচার করে দেখেন বলেই তাঁর মত বিচার্য।

শব্দ বা পদের মানে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য শব্দার্থতত্ত্বের প্রয়োজন নেই। যেমন নীতিতত্ত্বের প্রয়োজন নেই সাধারণভাবে ঠিক পথে চলবার জন্য। কিংবা যেমন বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য epistemology-র প্রয়োজন নেই। আজকাল 'ভদ্রতার খাতিরে নিত্য একটু আধটু কপটতা করতে হয়। তবে যে যাই বলুক কাজের বেলায় ভণ্ডামি চলে না। শব্দার্থের প্রকৃত রূপ কী বোঝবার প্রয়োজন যদি হয় তার কারণ হতে পারে কপটতা দেখে দেখে মন ক্লান্ত হয়েছে। বুদ্ধিকে সব ক্ষেত্রে বর্জন করলে কি বিজ্ঞানের উন্নতি হয়? শব্দার্থের প্রকৃত রূপ জানতে চাই বলে এই সমস্যা জটিল। শব্দার্থের প্রকৃত রূপ জানা নেই। এক এক বস্তুর সঙ্গে এক এক শব্দ বা পদের এমন মিল থাকা দরকার যে সেই শব্দ বা পদ শুনবামাত্র সেই বস্তু দেখতে পারা যাবে। শব্দার্থের প্রকৃত রূপ বলে কিছু থাকবে যদি এটি সম্ভব হয়। স্বতন্ত্রভাবে দেখবার ক্ষমতার ওপর জোর দিতে হবে। এক একটা শব্দ বা পদের সঙ্গে অনেকগুলি বস্তু বা বিষয় জড়িত থাকবে তা না হলে। শব্দার্থের জগৎ অসীম জগতের সঙ্গে মেলানো চাই। বিশেষ জগতের সঙ্গেও। শব্দার্থের একটা হদিস পাবো যদি এমন একটা বিশেষ শ্রেণীর দ্রব্য পাওয়া যায় যাকে স্বতন্ত্র ভাবে দেখানো সম্ভব অঙ্কের সাহায্যে বা অঙ্ক বাদ দিয়ে। তাহলে তার প্রকৃত রূপ বাস্তবিক কী তা জানতে পারব।

তবে মূল প্রশ্নের তুলনায় শব্দার্থের রকম সকম গৌণ। শব্দার্থ কি এক একটা দ্রব্য, না সম্বন্ধ, না ক্রিয়া, না প্রক্রিয়া, না পরিস্থিতি, না সাড়া, না কার্যসম্বন্ধীয় কারণ, না কার্যফল, না প্রতিমা, না অভিপ্রায়, না উদ্দেশ্য, না ঢুকে যাওয়া তালিকা, না পরিকল্পিত বক্ররেখা—এগুলো সবই গৌণ।

মূল প্রশ্নের উত্তর চাই। প্রশ্নটা এই: কোনো প্রণালী কি

আছে যার সাহায্যে অর্থকে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে অন্তর্গত বা তার থেকে বহির্গত করতে পারা যায়? যদি থাকে, এই প্রণালী হবে শব্দার্থের একটা মানচিত্র। এই নিয়ে কোনো গবেষণা হয়নি।

শব্দার্থের রূপ এতো রকম থাকতে পারে যে একটার গায়ে আর একটা এসে পড়ে বা একটার সঙ্গে আর একটা গুলিয়ে যায়। আঙুল দিয়ে আমরা দেখাতে পারি 'বিড়াল' মানে কী বা 'জুতো' মানে কী, কিন্তু আঙুল দিয়ে দেখাতে পারি না 'পক্ষিরাজ' মানে কী। বাস্তব সংখ্যা বা real number বলতে কী বোঝায় দেখাতে পারব না। বাস্তব সংখ্যার অর্থ যখন খুঁজি তখন যে প্রণালীর সাহায্যে dinosaur বা ঈর্ষার মানে বুঝি সে প্রণালী আমাদের কাজে লাগবে না। প্রায় দেখা যায় এক একটা সাধারণ শব্দের একাধিক অর্থ থাকে। আমার পাড়ায় যে বিড়াল ঘুরে বেড়ায় সেটা একটা 'বিড়াল'। কিন্তু বাঘও একটা 'বিড়াল' জাতীয় পশু। জাহাজে যে চাবুক দিয়ে খালাসিদের মারা হত আগেকার দিনে ইংরেজীতে সেটাও একটা 'cat'। এবং অন্যান্যদের দোষ ধরে যে মেয়ে ঘুরে বেড়ায় সেও ইংরাজী ভাষায় একটা 'cat'। গণিতে ফলের যে অর্থ হয় সেটা অন্য তত্ত্বে থাকে না। সব অর্থের এক রূপ নেই। খুব কম শব্দ আছে যার পরিধির মধ্যে অর্থ বিভিন্ন রূপ ধারণ করে না।

এই অবস্থার জন্য বৈজ্ঞানিক নিষ্ফলতা দায়ী নয়। কী ভাবে শব্দ ও পদ ব্যবহার করি দেখা যাক। যে শব্দ বা পদের অর্থ আছে তাকে দিয়ে চারটি মূল তত্ত্ব হয়।

(১) পুনর্বার প্রয়োগ করতে পারা যাবে:

'গরু' কাকে বলি জানি। বলতে পারি "এটা একটা গরু।" তবে আরো বলতে হবে, "এটা হচ্ছে সেই গরুটা।"

ব্যক্তির নামের বেলায়ও এই একই নিয়ম খাটবে। অনেক বার

দেখাতে পারি জবাহরলাল নেহেরুকে। অনেক বার পাঁচজনের মধ্যে তাঁকে খুঁজে বের করতে পারি। তাঁকে চিনতে অসুবিধা হয় না। এই দুটি কথা 'জবাহরলাল' এবং 'নেহরু' ভাষার অন্তর্গত। তারা শব্দ বা পদ। কিন্তু জবাহরলাল নেহরু একবার মাত্র দেখা দিয়ে অদৃশ্য হতেন, যদি ওঁর নাম মনে না থাকত বা ভাষার অন্তর্গত না হত। বার বার শব্দ বা পদ প্রয়োগ করা চাই।

(২) সীমাবদ্ধ রাখতে পারা যাবে :

"এটা একটা গরু নয়" যখন বলা হয় গরুর মানে সীমাবদ্ধ করা হয়। স্পষ্ট দেখানো হয় শব্দটা কোথায় ব্যবহার করা যায় না।

শব্দ বা পদের অর্থ থেকে বাদ দিতে হয় কিছু। না দিলে কোন অর্থ থাকে না। দিলে পরে শব্দ বা পদের প্রয়োগ কোথায় ও কতখানি উপযুক্ত বলতে হয় না। শব্দ ও সম্পর্কিত বস্তুর মধ্যে contrast থাকা চাই। Contrast না থাকলে কোথায় থামতে হবে জানা যায় না। জানা যায় না কখন 'না' বলার দরকার। জানা যায় না কী কী বাদ দিতে হবে। শব্দ বা পদের মানে থাকলে তবে তো জানা যাবে।

(৩) এক শব্দের বা পদের জায়গায় অন্য শব্দ বা পদ ব্যবহার করার ক্ষমতা থাকা চাই :

একটি বিশেষ জন্তু দেখে "গরু" বলতে পারি। "সেটা একটা গরু।" "গরু" একটা শব্দ। "গরুর" জায়গায় অন্য শব্দ বা পদ বসানো যায়। বলতে পারা যায় "এটা হচ্ছে সেই সুপরিচিত শৃঙ্গ-বিশিষ্ট গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণী।" একই অর্থ অন্য শব্দে প্রকাশ করা সম্ভব।

শব্দ বা পদ যা উল্লেখ করে তার নানা সম্পর্ক থাকে। সেই সম্পর্কগুলির মধ্যে মিল যদি না থাকে অর্থ বা মানে থাকবে না।

অর্থ বা মানে থাকবে যদি প্রতিশব্দ বা সমনাম বা প্রতিপদ বা সমার্থক শব্দ বা দ্ব্যর্থবোধক বা দ্বিভাবাত্মক শব্দ থাকে।

(৪) শব্দের কার্যক্ষেত্র প্রসারিত করতে পারা যায় :

"এটা একটা গরু" বলতে পারি ;

"এটাও একটা গরু" বলতেও পারি। অথবা "এটা অন্য এক জাতের গরু" বলতেও পারি।

অনির্দিষ্টভাবে এই গরু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যের সংখ্যা বাড়াতে পারা যায়। অন্য শ্রেণীর দ্রব্যের বেলাও তাই।

নাম বা উপাধির অর্থ সীমাবদ্ধ। তার কার্যক্ষেত্র প্রসারিত করা যায় না।

উপাধি বা নামের ভূমিকা সীমাবদ্ধ নয়। যার নাম তার নানা কর্তব্যকর্ম সমাজে। সে শিশু, পুত্র বা কন্যা, বালক বা বালিকা, তরুণ বা তরুণী, বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা, পিতা বা মাতা। সে ডাক পিওন, কেরাণী বা প্রধানমন্ত্রী। বিভিন্ন বয়সে মানুষ বিভিন্ন পদ পায়। এই সব উপায়ে শব্দের কার্যক্ষেত্র যদি প্রসারিত করতে পারা না যেত তবে এক একটা নাম বা উপাধি lost luggage ঘরে এক একটা tag-এর মতন হত। তার বেশী কিছু নয়।

এই কথা আর একরকম ভাবে বোঝানো যায়। শব্দার্থের মধ্যে কিঞ্চিৎ অস্পষ্টতা থাকে। শব্দ বা পদের অর্থের পরিধি সম্পূর্ণ জানা বা অজানা থাকলে অর্থ থাকে না।

Ferdinand de Saussure একটা প্রসিদ্ধ উক্তিতে এই কথা সুন্দর ভাবে সংক্ষেপে বলেছেন। Bloomfield তার সমর্থন করেন। তিনি লিখেছেন—"The connection of linguistic forms with their meanings is wholly arbitrary" অর্থাৎ পদ বা শব্দের সঙ্গে তার অর্থের সম্পর্ক সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী। যাকে ইংরেজীতে বলা হয়

"horse" তাকে ফরাসীতে বলা হয় "cheval"। বাংলায় বলা হয় "ঘোড়া"। সম্পূর্ণ খামখেয়ালী ভাবে এই নামকরণ হয়েছে। কোনো ন্যায়শাস্ত্রসঙ্গত কারণ নেই কেন এমন হবে।

কী বলা যায় এই উক্তির বিপক্ষে দেখা যাক। "Horse" শব্দটা নামহিসাবে যুক্তিসঙ্গত নাও হতে পারে। তবে "horse" শব্দ-হিসাবে যে ভাবে প্রয়োগ হয় তা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে। ধরে নেওয়া যাক আমাকে একটা ঘোড়া দেখিয়ে শিখিয়ে নেওয়া হয় "horse" এবং তার পরের মুহূর্তে আর একটি ঘোড়াকে দেখতে পাওয়া যায়। এই দ্বিতীয় ঘোড়াকেও আমি বলি "horse"। এই ব্যবহারে কি কোনো যুক্তি নেই? দুটি ঘোড়া কি একরকম দেখতে নয়? প্রাকৃতিক মিল অনুসারে নামকরণ তো হয়।

প্রাকৃতিক মিল থাকলে কায সম্পাদনার প্রণালীতে শব্দ প্রয়োগের একটা হদিস পাওয়া যায়। যদি বলি "বাঁ হাত" এবং তার পরে "ডান হাত" এবং তারপরে 'তার হাতের লেখা দৃঢ়" তাহলে যুক্তিসঙ্গত ভাবে প্রাকৃতিক মিল অনুসারে আমি "হাত" থেকে "লেখা" পর্যন্ত এগিয়ে যাই। একটা স্কুল যদি নতুন গৃহে উঠে যায় তার নাম বদলায় না। একই নামে তার পরিচিতি হয়। নামকরণ হয় বহির্জগতের প্রয়োজন অনুসারে এই ক্ষেত্রে। বস্তু বা বস্তুর নামের মধ্যে সম্পর্কটা খামখেয়ালী নয়। একটা শৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে। গবেষণা করা যায় এই ধরণের দৃষ্টান্ত নিয়ে।

তবু অস্বীকার করা যায় না যে নামকরণ মূলতঃ খামখেয়ালী ভাবে হয়। অর্থের যোগে শৃঙ্খলার স্বাধীনতা থাকে। প্রশ্ন হচ্ছে ঠিক কোন্‌খান থেকে প্রণালী গঠন শুরু হয়। শৃঙ্খলা থেকে যদি শুরু হয় আমরা টুক্‌রো টুক্‌রো মানে নিয়ে বিব্রত হব। ও বিব্রত হব সাজানো পদ্ধতির জটিলতার পরিণাম দেখে। এতো বিব্রত হতে

হয় যে আমরা বলতে শুরু করি ভাষাবিজ্ঞান তার শিশুকাল এখনও অতিক্রম করেনি। কেউ কেউ একটা মিথ্যা বিজ্ঞান খাড়া করতে চেষ্টা করেন। সুশৃঙ্খলতা যদি প্রাধান্য পায় স্বাধীনতা থাকে কেবলমাত্র যেখানে সুশৃঙ্খলতা অকৃতকার্য হয়।

স্বাধীন বা খামখেয়ালী ভাব থেকে প্রণালী গঠন যদি শুরু হয় তাহলে শৃঙ্খলার হেতু জানার জন্য কোনো বাড়তি অনুমান বা hypothesis দরকার হবে না। খামখেয়ালী ভাবের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থান পেতে পারে। স্বাধীনতা তার খামখেয়ালী ভাব নির্দিষ্ট একটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারে। বিস্তারের ক্ষেত্রেও খামখেয়ালী ভাব কম বা বেশী রাখতে পারা যায়। শৃঙ্খলা খামখেয়ালীর সুফল। শৃঙ্খলা অকৃতকার্যতার ফল নয়।

প্রণালী দুই রকম দেখা যায়। এক রকম স্বাধীনতাকে খর্ব করে। অন্যটা স্বাধীনতাকে সমর্থন করে। কোনো সামঞ্জস্য নেই। স্বাধীনতা যেখানে সেখানে সুশৃঙ্খলতা সমর্থন পায়। সুশৃঙ্খলতা যেখানে সেখানে স্বাধীনতা সমর্থন পায় না।

দেখা যাচ্ছে যদি প্রণালী গঠন শুরু করা হয় স্বাধীনতা থেকে তবে দুটি সুবিধা আছে। অন্য কোনো অনুমান বা hypothesis দরকার হয় না। এবং সুশৃঙ্খলতা ও স্বাধীনতার মধ্যে যে বিরোধ তা সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

শব্দার্থের স্বাভাবিক রূপ আছে বলে আংশিকভাবে বহুরূপ প্রদর্শন করা সম্ভব। এই স্বাভাবিক রূপ এক নয়, একাধিক। এই রূপগুলি এক এক করে কিন্তু দেখতে হবে। ভাষাবিজ্ঞান বা শব্দার্থবিজ্ঞান দায়ী নয় এর জন্য। দায়ী বিজ্ঞানের বহুত্বই। শব্দার্থ সম্বন্ধে যেজন কিছু জানতে চায় তাকে অনেক রকম বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়। যারা তর্জমা করতে চায় না, অভিধান তৈরী করতে

চায় বা ব্যাকরণ বিদ্যায় সিদ্ধ হতে চায় তাদেরকেও বহু বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়। সকলেরই বেলা একই বাধ্যতা। নিজের কর্মক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করতে হলে এতো রকম বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয়, এতো বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগ করতে হয় যে হয়রান হয়ে ওঠে মানুষ। এই হয়রানী বেড়ে চলেছে। বিশেষ জ্ঞানকে সাধারণ জ্ঞানের সামিল করে তুলতে হবেই। সবই প্রয়োজনীয়। এবং প্রয়োজনীয়তার পরিধি এতো বেড়ে চলেছে যে মানুষের মতন বাঁচতে হলে জ্ঞানচর্চা নিয়ত করতে হয়।

আজ আর কেউ বিশ্বাস করে না শব্দার্থবিজ্ঞান অপরিবর্তনশীল একটি প্রকৃতির সঙ্গে মেলানো অপরিবর্তনশীল একটা প্রণালী। বিভিন্ন প্রাকৃতিক রূপ যে যার মানসিক শ্রেণীতে আবদ্ধ রাখার উপায়ও তো নয়। নতুন রূপ আটকে রাখতেও পারে না। চোখের সামনে মানুষের অভিজ্ঞতার শাখা প্রশাখা বাড়ছে, ভাঙছে এবং নতুন গজিয়ে উঠছে। শব্দার্থের একটা প্রকৃত রূপ আছে স্বীকার করার ফলে কিছু আলোকপাত হতে পারে কোনো কোনো জ্ঞানের ক্ষেত্রে। তত্ত্বের কাছে যদি দিক নির্ণয় খুঁজি তাহলে এমন তত্ত্ব চাই যে সেই তত্ত্ব থেকে আমরা জানতে পাব কেমন করে আমরা চিন্তা করতে পারি নিজেকে খর্ব বা সংকীর্ণ না করে বা পুরানো অকেজো তত্ত্বের কবলে না পড়ে বা সব তত্ত্ব ত্যাগ না করে।

গদ্যের বিকাশ

কী অবস্থায় গদ্য গড়ে ওঠে এবং তার প্রকার কী তা বুঝতে চেষ্টা করব এখানে। কত রকম গদ্য আছে। দৈনন্দিন ব্যবহারে লাগে যে গদ্য এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবহারে লাগে যে গদ্য এ দুটো দেখা যাক। সাধারণ অপ্রসিদ্ধ গদ্যের ওপর জোর দেওয়া হবে। জার্মান ভাষায় এই রকম গদ্যকে বলা হয় Zwecksprosa। অলঙ্কারশাস্ত্রে এর স্থান নেই অথচ নিত্য ব্যবহার হয়ে থাকে। গোড়াতে একটা সমস্যা দেখা যায়। কোন্ পদরূপ কোন্ অর্থবাহক হিসাবে গ্রহণ করা হবে তার সম্বন্ধে যদি শ্রোতা এবং বক্তার মধ্যে মতৈক্য না থাকে তবে কোনো ভাষার সৃষ্টি সম্ভব নয়। অথচ শ্রোতা ও বক্তার মত যদি সম্পূর্ণ এক হয় ভাষার কোনো প্রয়োজন নেই। দুজনের মধ্যে অর্থবাহক হিসাবে পদরূপ ব্যবহার করার দরকার থাকে না। ভাষা আমাদের কাজে লাগে যে পরিমাণে আমরা ভাষার উপরে নির্ভর করি না অথচ ভাষা কার্যকরী হয় যে পরিমাণে আমরা ভাষার উপর নির্ভর করি। অসম্ভব মনে হতে পারে এই কথাটা। ভাগ্যিস এই উভয়সঙ্কটে পড়ে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হতে হয় না।

এই বৈপরীত্যের সমাধান করা যায় এমন উপায় আছে। তবে এর ফলে ভাষার ব্যবহারে একটা দ্বিত্ব থেকে যায়। ভাষার ওপর নির্ভরতা এবং ভাষা থেকে অনধীনতা—দুটোই অভ্যাসগত। ভাষার ওপর নির্ভর করে কবিতা। এটি যদি স্বীকার করি আমাদের আলোচনার সুবিধা হবে। কবিতায় এই নির্ভরতা সব চেয়ে বেশী

দেখা যায়। ভাষা থেকে অনধীনতা বেশী গদ্যে। বার্তা দেওয়া নেওয়ায় ভাষা একমাত্র উপায় নয়। (১) নানা সঙ্কেত দ্বারা মুখ্য স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান বিনিময় হয় ভাষা গড়ে ওঠার আগে। (২) অন্য ভাষার সাহায্যও নেওয়া যায়। (৩) বক্তা ও শ্রোতা উভয়ে সঙ্কেত বা প্রতীক ব্যবহার সমানভাবে করে। (৪) একই ভাষার গঠনে নানা পরিবর্তন ঘটতে পারে।

গদ্য আমাদের নিয়ে যায় কবিতা থেকে দূরে। কবিতার কথা আগে বলে শেষ করি। বার্তা দেওয়া নেওয়ার যে চারটি উপায় উল্লেখ করা হয়েছে তাদের ওপর কবিতাই বেশী নির্ভর করে। ভাষার ওপরে নির্ভরতা বেশী কবিতায়। অভ্যাসগত পরিচয়ে অনেক সময় পাওয়া যায় রস বা রুচির উপযোগিতার মানদণ্ড। পরিচিত স্বপ্ন ও স্মৃতি দেখা যায় ভালো কবিতার সহজ সরল সুরে। যারা ছোটো বেলা থেকে ভাষাটা বলে আসছে তারা ভাষার ব্যবহার অভ্যস্ত। কেবল তাদের কাছে বোধগম্য হয় মূলীভূত সম্বন্ধবিশিষ্ট পদবিন্যাস। এই জ্ঞান আপনা আপনি গজিয়ে ওঠে শিশুকালে খেলার সাথীর সঙ্গে কৌতুক করতে করতে। একই পর্যায়ে পড়ে সংসারের কথা, হাট বাজারের কথা, নানা কারিগরের কথা, মাঠে ঘাটে জাহাজে যে কথা বলা হয়। সৈনিকদের কথা। পরিচিত বলে এই ধরণের বার্তা দেওয়া নেওয়ার মধ্যে একটা সংশয়বিহীন নিরুদ্বিগ্ন ভাব থাকে। বার্তা বিনিময় ঠিকই হয় যদিও তাতে অব্যক্ত একটা অংশ আছে।

সঙ্কেত ভাষার অঙ্গ না হয়েও পরিচিত হতে পারে এবং তার সুযোগ নেওয়া যায়। এই ধরনের সঙ্কেত সঙ্গীতের ঝঙ্কার, গানের সুস্বর, নাচের লালিত্য, আঁকার রেখা। তাললয়যুক্ত গতি বা চলনভঙ্গী, উচ্চারণের খেলা, দ্ব্যর্থ বাক্য, চোখের এবং কানের কৌশল বা প্রতারণা—সকলেরই জন্যে। Lewis Carroll-এর প্রসিদ্ধ কবিতা

The Mouse's Tale (ইঁদুরের কাহিনী) যদি না ছাপা হতো ইঁদুরের লেজের আকারে (The Mouse's Tail) তার আকর্ষণ-শক্তি কম হত।

শ্রোতা ও বক্তা দু'জনেরই যদি অন্য ভাষার পদযোজনার সঙ্গে পরিচয় থাকে, তবে তার উপযোগিতা দেখা দিতে পারে। উপযোগিতার মূল্যায়ন করা যায় ক্ল্যাসিকাল ভাষার নক্সা প্রতিফলিত কী ভাবে হয়েছে দেখে। ইংরেজী সাহিত্যের গোড়াতে ল্যাটিন ছাঁচ বা model ব্যবহার হত। তারপরে ছাঁচ বা model নেওয়া হল ইতালিয়ান ও ফরাসী থেকে।

আংশিকভাবে বিযুক্ততার সুযোগ নিয়ে যখন ভাষা ব্যবহার করা হয় এবং সেই ব্যবহার সার্বজনীন অভিজ্ঞতায় পরিণত হয় তখন গঠন অর্থের আনুপাতিক হতে পারে। উপমার ভিত্তি এখানে। আচম্বিত একটা মিল আসে বিবেচিত অমিলের মধ্য থেকে। উপমার কাজ নয় সাধারণ একটা ব্যক্তার্থের স্থানে অসাধারণ বা বিরল ব্যক্তার্থ বসানো। কবি Burns যখন লিখলেন "my love is like a red, red rose" (প্রেম আমার লাল লাল গোলাপের মত) তখন লাল গোলাপের সঙ্গে প্রেমের সমরূপতা সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে স্থান পায়নি। নতুন শ্রেণীতে প্রেমকে অন্তর্ভুক্ত করতে কবি বলছেনও না। লাল গোলাপের সঙ্গে যদি কোনো দিন প্রেমের স্বতন্ত্রতা ঘুচে যায় এবং আমরা জানতে পাই প্রেম একটা লাল গোলাপ, তিমি যেমন মাছ নয়, মাছের মত প্রকাণ্ড একটা স্তন্য-পায়ী জীব, তা হলে কবিত্ব আর থাকবে না কবির এই কথায়। কবির কথায় কবিত্ব থাকে না যদি লেখা হয় : "my brother is a red, red rose." (ভাই আমার লাল, লাল গোলাপ)। বিরোধিতার একটা বিশেষ আবশ্যকতা আছেই। তবে এই বাক্যে কবিত্বহীন

বিরোধভাব রয়েছে। উপমা আমাদেরকে বুঝতে দেয় ভাষার ওপরে আমাদের নির্ভরতা কতখানি এবং এই নির্ভরতার গুরুত্ব কী রকম।

এখানে আমাদের কাজ গদ্য নিয়ে। কাব্য নিয়ে নয়। ভাষার গঠন ও অর্থ যে বন্ধনে বাঁধা সে বন্ধন থেকে গদ্য আমাদেরকে মুক্ত করতে চায়। যেসব অর্থ প্রকাশের উপায় ভাষা গড়ে ওঠার আগে থেকে আছে সেগুলি ভাষার মধ্যে এসে পড়ে ভাব প্রকাশ ও বিনিময় করতে করতে। গদ্য এর সুযোগ নেয়। ভিন্নজাতীয় পদও শব্দের সুযোগ নেয়। সুযোগ নেয় দ্ব্যর্থতারও। সুযোগ নেয় গঠন রূপান্তরশীলতারও। এক এক করে এই সবের আলোচনা করা যাবে, তবে তার আগে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। গঠন ও অর্থের মধ্যে নিখুঁত মিল আনতে চেষ্টা করে কবিতা। গদ্য চেষ্টা করে গঠন ও অর্থের মধ্যে অনধীনতা আনতে। উদ্দেশ্য কী? কবিতা সত্য প্রকাশ করে। গদ্যও সত্য প্রকাশ করে। কবিতা যা প্রকাশ করে তা সত্য। গদ্য যা প্রকাশ করে তাও সত্য। একাধিক রকম সত্য দেখা যাচ্ছে। কোনো মন্তব্য বিশেষ রূপে প্রকাশ করে কী লাভ, যদি সত্য দাবী না করা হয় কবিতায় হোক বা গদ্যে হোক? যেমন তেমন ভাবে বললেও চল্‌ত। সত্য নিয়ে গবেষণায় আমাদের কাজ নেই এখানে। এইটুকু জান্‌লে হয়—গদ্যের সত্য বার্তা বাহক। বৈজ্ঞানিক বার্তা, শাসনকার্যের বার্তা, বিবিধ সম্বন্ধসূচক বার্তা, শিল্প-বিষয়ক বার্তা এবং খবরের কাগজের বার্তা।

বিজ্ঞানের সব শাখার চর্চায় বার্তা বিনিময়ের যেসব পদ্ধতি ভাষা গড়ে ওঠার আগে থেকে আছে তাদের সঙ্গে একটা অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা হয়। এটি বিজ্ঞানের একটা বৈশিষ্ট্য। Polanyi বিজ্ঞানের এই দিকটা ভালো করে দেখিয়ে কয়েকটা কঠিন প্রশ্ন তোলেন।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেসব দেশ পরে নেমেছে তাদের সফলতা এতো কম কেন ? ডেনমার্ক নেহাৎ ছোটো একটা দেশ। কিন্তু সেখানে যে বৈজ্ঞানিক কাজ হয়েছে নবাগত দেশের কাজের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। যেসব দেশ আগে এই ক্ষেত্রে নেমেছে ডেনমার্ক তাদের একটি। পূর্ণশক্তিপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক এই পুরানো দেশ থেকে আনিয়ে যে নবাগত দেশে বিজ্ঞানচর্চা হয়েছে সেই দেশেও কার্যফল ভালো হয়েছে। সেখানে কাজ করার পুরো স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তাদেরকে। এর ব্যতিক্রম নেই।

কেন বা কী মনে করে উৎকৃষ্ট ধরনের সঙ্কেত বা বিস্ময়কর আবিষ্কার তাঁরা গ্রহণ করেন কি করেন না, বৈজ্ঞানিকরা অনেক সময় কথায় প্রকাশ করতে পারেন না। তবে বিজ্ঞানের পক্ষে কী ভালো হবে তাঁরা ঠিকই বুঝতে পারেন এবং যা তাঁদের কাজে লাগবে না তার পাশ কাটান, যদিও তাঁদের আচরণের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে পারেন না। জ্ঞানের প্রকৃত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে Polanyi এর উত্তর দেন। কোনো সঙ্কেত বা প্রস্তাব যতক্ষণ নিশ্চিত রূপে ঘোষণা করা না হয় ততক্ষণ বার্তা দেওয়া হয় না। বিশেষ সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশে সেই ঘোষণা একজনকেই করতে হয়। এতে বিপদ আছে। অন্য গবেষক প্রমাণ করে দেখাতে পারেন তাঁর প্রস্তাব ভুল। ঘোষণার ঝুঁকি নেওয়ার মধ্যে একটা নৈতিক বা আধ্যাত্মিক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভাব কম কি বেশী পরিমাণে থাকে। প্রকাশ্য সত্যের উপরে স্থাপিত নির্ভুল অবরোহমূলক আদর্শের কাছাকাছি এই ধরণের বৈজ্ঞানিক বিচার আসে না। কোনো সিদ্ধান্ত যখন নিশ্চিত ভাবে নির্ভুল নয় এবং কোন্ জায়গা থেকে গবেষণা শুরু করা হবে সঠিক ভাবে স্বপ্রকাশিত নয় তখন বৈজ্ঞানিককে নির্ভর করতে হয় তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা যা জানেন অথচ কথায় প্রকাশ করতে

পারেন না তার ওপরে। এর জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধিকার বা ঐতিহ্যের আশ্রয় নিতে হয়। যাঁরা ঐতিহ্যের কাছ থেকে দিক্ নির্ণয় চান বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃত্বের মত অনুসারে কাজ করেন তাঁদের মধ্যে কখনও একটা স্বতঃপ্রবৃত্ত স্থায়ী মতৈক্য হয় না। বৈজ্ঞানিকরা বরাবর লড়াই করে আসছেন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃত্বের সঙ্গে এবং কেবল বৈজ্ঞানিকরাই পারেন একটা স্থায়ী স্বতঃপ্রবৃত্ত সিদ্ধান্তে আসতে। কাজেই ঐতিহ্য এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃত্ব সম্বন্ধে কথা বলার অধিকার বিজ্ঞানের বেলায় বৈজ্ঞানিকদের যেমন আছে অন্য কারুর তেমন নেই।

সত্য সন্ধান অনেকখানি নির্ভর করে যে সব বার্তা দেওয়া নেওয়ার উপায় চলে আসছে ভাষা গড়ে ওঠার আগে থেকে, তাদের ওপরে সব চেয়ে অগ্রণী দেশেও। সব গদ্য লেখায় এমন পদ বা শব্দসমষ্টি থাকে যার পুরো মানে আভিধানিক অর্থে নেই। অষ্টম ভাষাবিদ্‌দের আন্তর্জাতিক সম্মেলন Oslo শহরে হল। সেখানে Paul Diderichsen আক্রমণ করলেন Bernard Bloch ও Zellig Harrisএর নতুন গবেষণার ফলকে। Diderichsen এসেছিলেন Copenhagen থেকে। Bloch ও Harris এসেছিলেন আমেরিকা থেকে। Diderichsen বলেন, যে মৌলিক তত্ত্বের ওপর তাঁরা ভিত্তি করে ভাষাবর্ণনাবিজ্ঞানের কাজ মূল্যায়ন করেছেন সেই তত্ত্ব ভুল। তাঁদের পক্ষ নিয়ে লড়লেন Kenneth Pike। Kenneth Pikeও আমেরিকা থেকে এসেছিলেন, কিন্তু Bloch ও Harrisএর বিপরীত মত পোষণ করেন, —ইনি আমেরিকায় তাঁদের সব চেয়ে বড় সমালোচক। তবু এই ক্ষেত্রে তাঁদেরকে ভুল বোঝাবুঝি থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন। Diderichsenএর ইংরেজীর কোনো দোষ ছিল না। যুক্তিবাদী দর্শনেও তাঁর দখল যথেষ্ট এবং তিনি কুমতিগ্রস্ত ছিলেন না। ব্যাপারটা অন্য। অসাধারণ যত্ন নিয়ে Bloch ও Harris তাঁদের

মন্তব্য গুছিয়ে লিখেছিলেন এবং সুস্পষ্টভাবে বক্তব্য প্রকাশ করার সম্বন্ধে উৎসাহোন্মত্ত ছিলেন। তা সত্ত্বেও বিস্তার বা distribution বলতে তাঁরা কী বোঝেন জানতে হলে যে ঐতিহ্য এবং অপরোক্ষ অনুভূতি বা intuition থেকে তাঁরা কাজ করেছেন তার সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচয় দরকার। কেবলমাত্র তাঁদের লিখিত মন্তব্য দেখে যদি সমালোচনা করা হয় অনেক ভুল ভ্রান্তি পাওয়া যাবে।

গদ্যের দ্বৈভাষিকতা দেখা যায় কথা বলার সময় বক্তার অঙ্গ-ভঙ্গীতে। নতুন একটা ভালো বই যদি কিনি ও তোমাকে তার সম্বন্ধে বলতে চাই বইটা হয়তো হাতে তুলে তোমার দিকে বাড়িয়ে দেব। হয়তো এটা খুলে নিজেই একটা কি দুটো পাতা দেখে নেব। অঙ্গভঙ্গীর সাংস্কৃতিক মূল্য আছে। বিভিন্ন সংস্কৃতিতে অঙ্গ-ভঙ্গীর স্বতন্ত্রতা থাকে। ভারতে অভিবাদন করার সময় দুহাত এক সঙ্গে তোলা হয় মুখের সামনে, যদিও এর ব্যতিক্রম ঘটে যখন ব্রীফ-কেস বা সাইকেল এক হাতে ধরতে হয়। আমেরিকায় নতুন যে জন আসে তার পক্ষে আমেরিকানদের সত্বর হাস্য হতবুদ্ধির কারণ হতে পারে প্রথমে। সাধারণ কথাবার্তার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী থাকেই। এই অঙ্গভঙ্গীর একটা প্রণালী আছে, এবং এই প্রণালী ভাষার প্রণালীর চেয়ে সীমাবদ্ধ। সেইজন্যে ভাষার পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার হয়। ভাষাকে সংশোধনও করে এবং কখনও কখনও ভাষার স্থান নেয়। চার রকম অঙ্গভঙ্গী দেখা যায় ভাষার সম্পর্কে (১) কথার ধ্বনি বা স্বর। অঙ্গভঙ্গীর মূল্যায়ন হয় ভাষার ন্যূনতম গঠনের সঙ্গে তার মিল দেখে। (২) অর্থের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গীর যোগাযোগ থাকে। হাসি, হাত তোলা, মাথা নাড়া, কাঁধ ঝাড়া ইত্যাদি। (৩) অর্থের প্রভেদ দেখানো হয় অঙ্গভঙ্গী দিয়ে যখন উচ্চারণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় না। যেমন "write" এবং "right" বা "tale" এবং "tail"। কোন্ কথার কী মানে

হাত নেড়ে দেখানো হয়। (৪) ধ্বনি বা স্বরের প্রভেদ দেখানো হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সুরের সারির মধ্যে ধ্বনির স্বতন্ত্রতা স্পষ্ট করা হয়। অঙ্গভঙ্গীর দুটি কাজ এই ক্ষেত্রে। টেলিফোনে কথা বলার সময় এটা প্রায় হয়। নাম বোঝাতেও নামের বানান বলতে হয় এই রকম করে—P for Peter, U for University, N for No, Y for York, A for Alfred। সব মিলিয়ে Punya (পুণ্য)। Charade-এর মতো অনেক প্রহেলিকায় এই অঙ্গভঙ্গীর প্রণালী ব্যবহার হয়।

লিপি বা লিখিত বর্ণমালার মধ্যে এটা দেখা যায় পরিণত অবস্থায়। Jacobsen ধ্বনির বর্ণমালার সঙ্গে লিখিত বর্ণমালার মৌলিক প্রভেদ দেখিয়েছেন। পরস্পরের সঙ্গে পার্থক্য অনুসারে ধ্বনি বর্ণমালার উপাদান নির্দেশ করে। সংখ্যা যথাসম্ভব কম রাখা হয়। ধ্বনিমালার উপাদানের ওপরে লিখিত বর্ণমালার উপাদানের সংখ্যা, আকার ও প্রকার নির্ভর করে। সম্পর্ক দেখে ঠিক করা হয়। দিকের সঙ্গে দিক্, সংখ্যার সঙ্গে সংখ্যা, মূল্যের সঙ্গে মূল্য, পরিমাণের সঙ্গে পরিমাণ মিলিয়ে দেওয়া হয়। গণিতের সঙ্গে এই মৌলিক সাম্য থাকাতে লিখিত বর্ণমালা হয় একপ্রকার জ্যামিতি বা বীজ গণিতের সমান। বস্তুর অস্তিত্বে বা আকারে ধ্বনিমালার অস্তিত্বের সমর্থন দরকার নেই। আকারেরও সমর্থন দরকার নেই। তবে লিখিত বর্ণমালার অস্তিত্ব ও আকার সমর্থন পায় ধ্বনিমালার অস্তিত্বের ও আকারের মধ্যে। সাধারণভাবে এর সঙ্গে চারটি সম্ভাবনা লিপ্ত। এই চারটি সব লিখিত ভাষায় দেখা যায়। (১) লিখিত বর্ণমালা বা লিপির উপাদানের সঙ্গে ধ্বনিমালার উপাদানের মিল থাকে। (২) অর্থমালার উপাদানের সঙ্গে মিল থাকে। (৩) অর্থমালার উপাদানের সঙ্গে আগে মিল ঠিক রেখে ধ্বনিমালার উপাদানের সঙ্গে মেলানো

থাকে। (৪) ধ্বনিমালার সঙ্গে মিল রেখে অর্থমালার সঙ্গে মেলানো থাকে।

ইংরেজীতে প্রথম সম্ভাবনার উদাহরণ p-i-t এই তিনটি অক্ষর। দ্বিতীয় সম্ভাবনার মধ্যে পড়ে চিহ্ন, যেমন +, – এবং &। তৃতীয়টা আমরা দেখতে পাই "Luck-now" কথাতে বা "fun and fan-sea" কথাতে। চতুর্থ টা "write" এবং "right" এই দুটো কথার মধ্যে পাই।

এই চার রকম সম্ভাবনাকে বলা হয় (১) phonemic, (২) ideo-graphic, (৩) rebus এবং (৪) morphophonemic।

অর্থমালার উপাদানের সঙ্গে লিপি বা লিখিত বর্ণমালার উপাদানের মিল যতখানি সমান তার মূল্য তত বেশী। অর্থমালার সঙ্গে ধ্বনিমালা মেলানো আগে থেকে হয়ে থাকে। লিপি হচ্ছে ভাষার দ্বৈভাষিক পরিপূরক ও সংশোধক, এবং কখনও কখনও ভাষার প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

লেখার প্রণালীতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন লিপির মধ্যে কোনটার কার্যকরিতা বেশী এবং স্পষ্ট সহজে ঠিক করা যায় অথচ বিভিন্ন ভাষার মধ্যে কোনটার কার্যকরিতা বেশী ঠিক করা দুরূহ ব্যাপার। জাপানে যে পাঠ্যক্রম বা course অন্ধ ছেলেমেয়েরা চার বৎসরে শেষ করে সাধারণ ছেলেমেয়েদের শেষ করতে পাঁচ বৎসর লাগে। তার কারণ অন্ধ ছেলেমেয়েরা একটা semi-phonemic Braille লিপি দিয়ে পড়াশুনা করে। অন্য ছেলেমেয়েরা Kanamajiri লিপিতে পড়ে। আরবী লিপিতে আরবী শব্দের ধাতুরূপ যে ভাবে দেখানো হয় রোমান লিপিতে সেই ভাবে দেখানো যায় না। রোমান লিপিতে স্বরবর্ণ চিহ্নিত করা হয় সোজা রেখা দিয়ে। আরবী ধাতুতে থাকে তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণের সমষ্টি। কাজেই বিঘ্ন আসে। সংস্কৃত

স্বরবর্ণের সংযুক্ত গঠন রোমান লিপিতে যেমন স্পষ্টভাবে দেখানো যায় তেমন দেবনাগরী লিপিতে দেখানো যায় না। দেবনাগরীতে উল্লেখই হয় না যে স্বরবর্ণ সব চেয়ে বেশী ব্যবহার হয়। অন্য স্বরবর্ণ লেখা হয় প্রভেদকারী চিহ্ন দিয়ে। এর ফলে একটা মূল বৈশিষ্ট্য ঢাকা পড়ে ও অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়। প্রভেদকারী চিহ্নের চেয়ে digraphs ব্যবহার করা ভালো, কেননা ছাপাখানায় দেওয়ার আগে অক্ষরগুলি যথাসম্ভব স্পষ্টভাবে সাজাতে হয়। একই কারণে digraphs ভালো diacritics-এর চেয়ে, encritics ভালো pre-critics-এর চেয়ে, precritics ভালো super বা subcritics-এর চেয়ে এবং রোমান লিপির মতন "standing" বা খাড়া supercritics ভালো subcritics-এর চেয়ে। এই ধরণের বিচার আরবী ও রোমান অঙ্কবোধক চিহ্নের গুণ নির্ণয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। দুটোই সুস্পষ্ট। ভাষার গুণ তুলনা করা বৃথা একটা প্রচেষ্টা মনে হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই গদ্যের বিকাশ সম্ভব কেবলমাত্র লিখিত ভাষায়। বার্তা দেওয়া নেওয়ার মধ্যে উচ্চারিত স্বরের চেয়ে লিখিত অক্ষরের কার্যকরিতা বেশী। শব্দকে ছাড়িয়ে যায়। Morpho-phonemic শব্দ বানানে এটা দেখা যায়। শব্দ বানানে উচ্চারিত স্বরের সঙ্গে মিল প্রায় থাকে না। Ideogram-এর বেলায় এটা সব চেয়ে বেশী দেখা যায়। মত বা কথা বা চিন্তা বা ভাব চিহ্নিত করার সময়। চীন ভাষায় ideograms নিয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত। একজনের কাছে যা মিতব্যয় মনে হয় অন্যের কাছে তা অপচয়পূর্ণ। যে ভাষায় বহু ধার করা শব্দ আছে এবং এক এক শব্দের ওপরে জোর দিয়ে কথা বলার নিয়ম চলে সেই ভাষায় লিপির সঙ্গে উচ্চারিত স্বর না মিলিয়ে বানান করা সুবিধাজনক। দ্রুত পড়ার বেলায় ideo-

gram সহায়তা করে, যেমন বীজগণিতের চিহ্ন আধুনিক যুক্তিবাদী দর্শনে আলোচনার সহায়তা করে। চোখে দেখে চেনা, কানে শুনে চেনার চেয়ে তিন গুণ দ্রুত বলে ideographic বা morphophonemic লিপি বেশী কার্যকরী হতে পারে, তবে এই কার্যকরিতা বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ এবং সেই কারণে প্রসার ও দক্ষতা দুই কম থাকবে। অর্থ যেমন স্থায়িত্ব লাভ করবে তেমনি বিচ্ছিন্নও থাকবে। যে ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞানের প্রকাশ অনেক দূর এগিয়েছে এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই ক্ষেত্রে morphophonemic বা ideographic লিপি উৎকৃষ্ট হতে পারে। অর্থ দ্রুত গ্রহণ করা সম্ভব এই অবস্থায়। তবে morpho-phonemic বা ideographic লিপি অসুবিধার কারণ হতে পারে যেখানে এই রকম বিকাশ হয়নি। এমন লিপি নিকৃষ্ট এই অবস্থায়।

গদ্যের উন্মেষ ও বিস্তারে আরো দু'রকম ভাবে লিপি সাহায্য করে। ঘটনা বা অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে প্রমাণ রাখার প্রধান উপায়। সাক্ষ্য সৃষ্টি হয়। এবং লিপিবদ্ধ যা তা উল্‌টিয়ে দিতে পারা যায়। পরিবর্তন করা যায়। Reversibility যাকে বলা হয় তাই থাকে। চোখ বুলিয়ে দেখে নিতে পারি কী কী আগে লেখা হয়েছে। বাক্য বা statement লম্বা হতে পারে। শুধু কানে শুনে অতটা মনে রাখা যায় না। অভিজ্ঞতা শৃঙ্খলাবদ্ধ করা সম্ভব হয়। বাক্য বাড়িয়ে সাজিয়ে বই লেখা যায়। শ্রোতাকে সামনে রাখার দরকার নেই। লেখা অবাধে অনেক দূর যেতে পারে। দেশে দেশে এবং যুগে যুগে তার বিস্তার। স্পষ্টতঃ এই কারণে বিশেষ দরকার। অঙ্গভঙ্গী দিয়ে শ্রোতাকে যা বোঝানো যেত তা লেখার অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। স্পষ্ট করে বর্ণনা করতে হয় ঐতিহাসিক ও সামাজিক স্থান ও কাল। বিনা প্রমাণে পাঠক কিছু গ্রহণ করে না। মৌন-

সম্মতি শ্রোতার কাছে পাওয়া যাবে না তা না হলে। গদ্যের ওপরে লেখার প্রভাব পড়ে উচ্চারণেও। Savory দেখিয়েছেন একটি কথাই আট রকম ভাবে উচ্চারিত হতে পারে ইংরেজীতে। কথাটা 'epigyne'। জীববিজ্ঞানীরা কিন্তু খুব একটা অসুবিধা বোধ করেন না এই বিভিন্ন উচ্চারণের ফলে। তাঁদের কাজ ঠিকই চলে।

শব্দের বানান দৃঢ় হলে উচ্চারণে সমতা আনা সহজ হয়। বানান অনুসারে উচ্চারণ বা spelling pronunciation প্রচলিত হয়। উপভাষায় এবং প্রাদেশিক ভাষায় বিভিন্ন ভাবে উচ্চারণ হয়।

আঞ্চলিক বা সামাজিক প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ সাধারণভাবে যদি গৃহীত হয় নির্দিষ্ট একটা আদর্শ হিসাবে, গুণবৈষম্য দ্বারা বিশেষ বার্তা জ্ঞাত করতে পারা যায়। এমন শব্দের ব্যবহার নির্দিষ্ট ও সীমিত হয় স্টাইল ও সাধনা অনুসারে। মূল বচন লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে এটা সম্ভব। বচনের দীর্ঘতা ও বিচিত্রতা দুই বেড়ে গেছে।

একমাত্র স্মরণশক্তির ওপর সাধারণ বচনে শব্দের ব্যবহার আর নির্ভর করে না। এর ফলে অর্থের অন্যতর ব্যবহারের অদল বদলের মধ্যে নমনীয়তা বাড়ে। কাঠিন্য কমে।

অন্য ভাষার জ্ঞান উৎস থেকে যখন গবেষক সাহায্য নিতে বাধ্য হয় তখন একাধিক ভাষার প্রভাব গদ্যের ওপরে দেখা যায়। গোড়ার দিকে এই প্রভাব বেশী স্পষ্ট। ইংরেজীর গদ্য গঠন যাদের হাতে তারা ল্যাটিন ভাষার ওপর নির্ভরশীল। ল্যাটিন ভাষার পুরুষানুক্রমিক পদ্ধতি অনুসারে বস্তু সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করা এবং ধারণা বা মত বিশ্লেষণ করাও হল। ল্যাটিন গড়ে উঠল গ্রীকের সাহায্যে। সংস্কৃত, চীন, গ্রীক ও হীব্রু এর ব্যতিক্রম। তবে প্রতিরূপ নিয়ে আমাদের কাজ। আজকাল কোন সমাজ একা একা সভ্যতা সৃষ্টি করতে বাধ্য নয়। আগের মত বিচ্ছিন্নতা আর নেই। গদ্য যারা গড়ে তুলেছে

তাদের অধিকাংশ দ্বৈভাষিক। একাধিক ভাষার ওপরে দখল রাখতে বৈজ্ঞানিকরা বাধ্য। ইংরেজী ফরাসী জার্মান জানতেই হয়। মানব ধর্মে বিশ্বাসী যারা তাদের গ্রীক ল্যাটিনও জানা চাই। হীব্রু জানা থাকলে আরো ভালো। স্কুলে গ্রীক ল্যাটিন পড়া আর আবশ্যক না হলেও হাজার হাজার ধার করা কথা ভাষায় রযে গেছে। এমনিতে খানিকটা শেখা হয় যায়। ল্যাটিন গ্রীক থেকে রেহাই নেই।

নিত্য নতুন পদ বা শব্দ ভাষার ভিতর থেকে তৈরী হয়। জার্মানে দেখা যায় বিশেষণ প্রায় ধার করা কথা হয় এবং বিশেষ্য স্থানীয়—যেমন Fernsprecher / telephonisch। প্রত্যেকটি হাইস্কুল ছাত্রই ইংরেজী বা ফরাসী বা ইতালিয়ান শিখতে বাধ্য। শেখার বোঝা ভারী। সংস্কৃত গদ্যের সবচেয়ে সুখের দিনে, ভারতের মধ্যযুগে, যাঁরা লিখতেন তাঁরা একাধিক ভাষা জানতেন। তাঁদের রচনার মধ্যে অনেক পদ, উপমা, প্রণালী দেখা যায় যার অস্তিত্ব ছিল না সংস্কৃতে গোড়ার দিকে। উল্লেখযোগ্য যা এখানে তা এই যে, ভাষার বন্ধন থেকে আমাদের চিন্তাধারা মুক্ত করার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে একাধিক ভাষায় শব্দার্থ সন্ধান করে ভাষান্তর করা।

নতুন শিল্পবিষয়ক পরিভাষা তৈরী করার বেলায় একাধিক ভাষার প্রভাব স্পষ্ট করে দেখা যায়। নতুন কোনো উপলব্ধি বা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতে হলে নতুন একটা নাম বা সংজ্ঞা প্রয়োজন হয়। নতুন নাম বা সংজ্ঞা কোথায় পাওয়া যাবে? পুরানো কথা এক রাশ হাতের কাছে রয়েছে। তা থেকে শব্দ বেছে নিয়ে নতুন উপলব্ধি বা সিদ্ধান্তের একটা বিশিষ্ট দিক স্থূলভাবে চিহ্নিত করতে পারা যায়। একটা অসুখকে বলতে পারা যায় "to be a crack-pot"। "Crack" বলতে কী বোঝায় সকলেই জানে। "Pot" কাকে বলে তাও জানা। এবং পাত্র ফাটা হলে কী হয় তাও

জানা। মাথাকে পাত্র বলা হয়ে থাকেই। তবু "crackpot" শব্দ-হিসাবে সন্তোষজনক নয়। তার সঙ্গে নানা বিষয় জড়ানো। ভুল ভ্রান্তি সহজে হতে পারে। একটা গল্প বলি। দুজন ক্রিকেট খেলোয়াড় ঠিক করল "না"-এর জায়গায় "হ্যাঁ" আর "হ্যাঁ"-এর জায়গায় "না" বলবে। তাদের প্রতিপক্ষ বুঝতে পারবে না। প্রতিপক্ষ তো বিহ্বল হলই এবং নিজেরা হতবুদ্ধি হয়ে খেলায় বিশৃঙ্খলা বাধিয়ে দিল। নতুন শিল্পবিষয়ক পরিভাষা কার্যকরী হওয়া দরকার। পুরানো অর্থের সঙ্গে যোগাযোগ যত কম থাকে তত ভালো।

পুরানো অর্থ জড়ানো থাকে সব চেয়ে বেশী সুলভ শব্দের সঙ্গে। সে সুলভ শব্দ বাদ দিতে হয় যখন নতুন উপলব্ধি বা সিদ্ধান্তের মানে সুদৃঢ় ও সূক্ষ্মভাবে চিহ্নিত করতে হয়। পুরানো অর্থের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করা সহজ নয়। "Crackpot" কথাটা চল্‌তি ইংরেজীতে যা বর্ণনা করে "Schizophrenia" তাই করে নকল গ্রীকে। "Schizophrenia" কথাটা অনেক বেশী কার্যকরী। এমন শব্দ কোথায় পাওয়া যায় যার সঙ্গে পুরানো অর্থ জড়ানো নেই? পদ্ধতি একটা নিশ্চয় আছে। নিয়মহীনভাবে শব্দ বানানো অতিশয় শ্রমসাধ্য। প্রকাশ্য নিয়ম এড়িয়ে গেলেও অপ্রকাশ্য বা unconscious অর্থের যোগাযোগ উপস্থিত থেকে অজ্ঞাতভাবে প্রভাবিত করতে পারে শব্দ নির্বাচন। "Flack" একটা ইংরেজী বানানো কথা। "Flack"-এর মানে জানার আগে অন্য অনেক শব্দর মানে আসে, যেমন flick, flap, pack, flying ইত্যাদি। "Sonar"-এর মত শব্দ শুনবা মাত্র তার মানে, এমনিতে যেন খানিকটা বোঝা যায় supersonic, sonometer এবং radar ইত্যাদি সমার্থক আছে কি নেই জানার আগে। নামকরণের আর একটা উপায় হচ্ছে

আবিষ্কারকের উপাধি বা তার প্রিয়স্থানের নাম ব্যবহার করা। যেমন Volt, Watt, Polonium, Berkalium ইত্যাদি। যোগাযোগের বোঝা যাতে অধিক না হয় সে বিষয়ে সতর্কতা দরকার অথচ শব্দের মানে একটা ইঙ্গিতেও দেওয়া চলে। সুলভ কথার সঙ্গে অনুরূপতা দেখে একটা বিশ্বাস জাগে যে সামান্য চেষ্টা করলেই নতুন শব্দের অর্থ পুরাপুরিভাবে জানা যায়। যেমন helicopter এবং heliotrope বা helium, copper, Coptic, filter, bannister ইত্যাদি। যে চেষ্টা দরকার মনে হয় তা এতো সামান্য যে, সময় তেমন লাগবে না, তবে সেই কারণে অনেকে চেষ্টা করে না।

নতুন উপলব্ধি বা সিদ্ধান্তের সঙ্গে একটা বড় জ্ঞানের সমূহ যখন যুক্ত থাকে এবং নতুন নাম বা সংজ্ঞার অর্থ যখন অস্পষ্ট তখন শব্দের মানে বদলে যেতে পারে। টক রসের উৎস বলে যার পরিচয় তা নাম না বদলিয়ে অন্য গুণের জন্য পরিচিত হয়ে উঠতে পারে, যেমন oxygen। নাম বদলানোও সহজ নয়। বস্তু সম্বন্ধে ধারণা বদলানো বরং সহজ। নাম যতক্ষণ একই থাকে তার আনুষঙ্গিক অবিচ্ছিন্নতাও মোটামুটিভাবে রক্ষা হয়। বিভিন্ন অর্থের মধ্যে একটা ব্যাখ্যা সম্ভব বলে একটা আশা থাকে। তবে পাঠক সুলভ শব্দের নতুন দুর্লভ অর্থ দেখে হতবুদ্ধি হতে পারে। অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না যা প্রথমে সকলেরই বোধগম্য মনে হল। যারা এই রকম পরিবর্তন ঘটায় তাদের প্রতি পাঠকের ভীতি জাগতে পারে। অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা ইংরেজদের মধ্যে যেমন দেখা যায় জার্মানদের মধ্যে তেমন নেই। ইংরেজরা ধার করা মনোভাব পোষণ করে। জার্মানদের মনোভাব গঠনশীল। একথা অবান্তর নাও হতে পারে এখানে।

শব্দ বানানোর আর একটা উপায় আছে। চল্‌তি কথা থেকে

উপাদান ধার করে জুড়ে নিয়ে নতুন নাম বা সংজ্ঞা করা যায়। যখন নতুন উপলব্ধি বা সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় বা স্পষ্ট নয় তখন যদি নতুন নাম বা সংজ্ঞার উপাদান সুবিবেচিতভাবে নির্বাচিত হয় তবে গবেষকের কাজ এগিয়ে দিতে পারে। এতে বাধা সৃষ্টি হয় না। বরং সাহায্য হয়। গণিতের সঙ্গে কয়েকটা সাধারণ সমূহের সাদৃশ্য বা সমতা দেখে যদি কোনো নতুন ধারণা বা conceptকে বলা হয় একটা calculus তা হলে খোঁজ করতে পারা যায় আরও কোনো মিল গণিতের সঙ্গে আছে কি নেই। হয়তো দেখা যাবে অনেক বিষয়ে মিল নেই। মিল নেই বলে নতুন ধারণা বা concept একটা অসাধারণ বা খামখেয়ালী ধরণের গণিত হতে পারে। হয়তো দেখা যাবে সব রকম মিল আছে। এতো সমতা বা সাদৃশ্য থাকতে পারে কেউ কোনো দিন হয়তো ভাবে নি। বিজ্ঞানের তত্ত্ববিদ্যায় বহু মৌলিক শব্দ এই ধরণের। এমন শব্দ তালিকাভুক্ত বা শ্রেণী-বিভক্ত সচরাচর হয় না। Force, energy, number—এইরূপ শব্দ দিয়ে একটিমাত্র উপলব্ধির পরিচয় দেওয়া হয় না। এক একটা শব্দ একই গোত্রভুক্ত অনেকগুলি ধারণার সমষ্টি।

সুদৃঢ় রূপ ধারণ করার আগে যখন উপলব্ধি বা সিদ্ধান্ত তরল অস্পষ্ট অবস্থায় থাকে তখন এই ভাবে শব্দ বানানো মিতব্যয় হয়। এক শতাব্দী ধরে জার্মানীতে মৌলিক বিজ্ঞানের গ্রন্থের প্রকাশ অন্য দেশের চেয়ে বেশী বলে জার্মান ভাষায় এমন বিপুলভাবে শব্দ বানানো সম্ভব হয়েছে।

শিল্পবিষয়ক পরিভাষাকে কার্যকরী করার সব চেয়ে মিতব্যয়ী উপায় হচ্ছে নতুন উপলব্ধি বা সিদ্ধান্ত স্পষ্ট আকার ধারণ করার পরে তার নামকরণ। এবং সেই নামের শব্দ বা উপাদান এমন জায়গা থেকে নিতে হয় যে বোধগম্যতার আশ্বাস থাকে অথচ পুরানো অর্থের

যোগাযোগ অসহ্য একটা বোঝা হয় না। ইংরেজীতে শব্দ ল্যাটিন ও গ্রীক থেকে ধার করে এই সমস্যার সমাধান হয়। ল্যাটিন ও গ্রীকের প্রতি ইংরেজদের শ্রদ্ধা আছে। হিন্দীর বেলায় শব্দ নেওয়া হয় সংস্কৃত বা ইংরেজী থেকে। ভাষার ভিতর থেকে শব্দ নিয়েও এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। নতুন শব্দ ধার করা শব্দের সমান হয়ে ওঠে। জার্মানে চলতি কথায় Rundfunk হয় radio। অল্প পরিচিত উপভাষা থেকেও শব্দ নেওয়া চলে। জনসাধারণের কাছে বিদেশী শব্দের মত হয়।

একই ভাষার মধ্যেও সজীব উপাদানের ব্যবহার এমন করা যায় যাতে অর্থের পরিবর্তন ঘটে। স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা দুই রক্ষা হয়। প্রত্যেকটি ভাষায় উপায় থাকে নিজের অর্থের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার। লিঙ্গ নির্দেশ যেখানে অবশ্য কর্তব্য সেখানে "he" বা "she" লিখতে পারা যায় বা বহুবচনে "they"। যেখানে দুটিমাত্র আলাদা কথা বাক্যের সঙ্গে বাক্য যোগ করার জন্য রয়েছে—যেমন "and" এবং "or"—সেখানে "and / or" লেখা যায়। যদি "lie" হয় "lie" (মিথ্যা) তা হলে তার স্থানে বসানো যায় "terminological inexactitude"। "Bright" কথাটা যদি বসানো থাকে কোনো বাক্যে তার বদলে "illuminated" দেওয়া যায়। সেটা হয়তো ভালো হবে। একজনকে যখন "brave" বলা হয় তাকে "brave and courageous" বললে আরো সুন্দর শোনাতে পারে। ভাষাকে মুক্ত করার পদ্ধতি হচ্ছে নির্ধারিত বিধি। প্রতিশব্দের স্তূপ, বাক্য-বাহুল্য, পার্থক্য—সবই এই পদ্ধতি। সাধারণভাবে বলা হয় ন্যায়শাস্ত্রসঙ্গত বা যুক্তিবাদসম্মত। এই যুক্তিবাদ Russell বা Booleর যুক্তিবাদ নয় অবশ্য। তাঁরা দ্বৈভাষিক চিন্তার সঙ্কেত বা ideogram ব্যবহার করেন। এই যুক্তিবাদ বর্ণনা করার জন্য Kant-

এর দেখাদেখি একটা বিশেষণ "transcendental" বা অতিলৌকিক ব্যবহার করা চলে। অন্য সংজ্ঞা বেছে নেওয়া আরো সঙ্গত হতে পারে—ধরুন, যৌক্তিকতা বা rationality। গদ্য যুক্তিসঙ্গত।

এই কথা বিস্তারিত আলোচনার উপযুক্ত। আমাদের বিষয় এখানে গদ্য, পদ্য-গদ্য নয়। পদ্য-গদ্য বলতে বুঝি গদ্যের আকারে যা লেখা হয়েছে কবিত্ব করার উদ্দেশ্যে। গদ্যের গুণ যদি থাকে গদ্য কবিতায় তাকে এখানে স্থান দিতে পারা যায়। গদ্য কী বিশ্লেষণ করে বুঝতে চেষ্টা করছি। মাপ বা আকার থেকে অর্থকে আলাদা করে দেখতে হবে। রূপ ও আকারকে নিখুঁত সাহচর্যে বাঁধতে চেষ্টা করছি না। ভাষার অর্থের সমষ্টি এবং পদের আকৃতি যেমনটি আছে তেমনিটি যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে আমরা সাহস করে বলতে পারব না এই রকম সরল বাক্য "This is a robin. A robin is a bird।" একটি robin যদি কেবল robin হতে পারে তাহলে কী করে সে bird হবে? দুটি স্বতন্ত্র সমান অর্থের মর্যাদাহানি করে একটাকে আত্মসাৎ এবং অপরটাকে অধীন করা হয়। এই বাক্যগুলো দেখুন, "Potentiality and probability are not the same. The former implies reference to a conditional reality and the latter to a conditional acceptance of reality. অর্থাৎ "সুপ্ত যা তা সম্ভাব্য নয়। সম্ভাব্য যা তা সুপ্ত নয়। সুপ্ত যা তা নিয়মাপেক্ষী বাস্তব সম্বন্ধীয়। সম্ভাব্য যা তা নিয়মাপেক্ষী বাস্তবের গ্রহণ সম্বন্ধীয়।" এখানে বক্তা আমাদেরকে জানিয়ে রাখছেন যে, যা তিনি 'শোনাতে যাচ্ছেন তার মধ্যে যা সুপ্ত এবং যা সম্ভাব্য এই দুটি জিনিসকে মিথ্যা একতা ও অতিরিক্ততা থেকে উদ্ধার করে, তাদের পরস্পরের তুলনায় গুণগত বৈষম্য দেখাবেন। Nida তো এক জায়গায় লিখেছেন কোনো দুটি শব্দ নেই যার অর্থ হুবহু এক। ভাষার মধ্যে নেই। ভাষায়

বাইরেও নেই। তাই যদি হয়ে থাকে, সমগ্র ভাষার বিন্যাস দেখা যাক আমাদের দৃষ্টি বিশেষ সীমিত বচনে আবদ্ধ না রেখে। প্রত্যেকটি প্রতিশব্দের মানদণ্ড থাকে। মানদণ্ড একাধিক হতে পারে। একটা মানদণ্ড অন্যগুলোর চেয়ে কার্যকরী হয়। এই মানদণ্ড সমানভাবে স্থায়ী নাও থাকতে পারে। তবে মানদণ্ড নেই তা নয়। আছে।

গদ্যের বিকাশে যৌক্তিকতার ভূমিকাটাকে আর একটু বিশ্লেষণ করা দরকার। বিপরীত যুগল শক্তির সারির বর্ণনা করে দেখব। যে গদ্য সবচেয়ে কম বিকশিত সেই গদ্যের বিভিন্নতাও সবচেয়ে কম। এমন গদ্য এতো জনপ্রিয় যে যথোচিত নির্ভুলতা থাকে না। এতো জ্ঞানসম্পন্ন হতে পারে যে সাধারণ অনুভূতির মধ্যে আসে না। এতো মিতব্যয়ী হতে পারে যে বোধগম্যতা কম এবং এতো পুনরুক্তি-ভরা যে ব্যবহারে তার কার্যকরিতা কম। গদ্যের বিকাশ বেশ খানিকটা না হলে বিস্তীর্ণ ভাবে ভাষান্তর করা যায় না জনপ্রিয় রীতি, বিদ্বান বা নিপুণ রীতি বা বৈজ্ঞানিক রীতি বা শিল্পবিদ্যার পারিভাষিক রীতি অনুসারে। শব্দার্থ প্রকাশিকায় দেখা যায় এই যুগ্ম বৈপরীত্যের ফলে এমন সব শব্দ সহজপ্রাপ্য হয় যার অর্থে সঙ্কুচিত নিশ্চয়তা থাকে অথচ তা অতিরিক্ত যোগাযোগের বোঝা থেকে মুক্ত এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা কঠিন নয়। তা জ্ঞান-সম্পন্ন শব্দও বটে। পদযোজনার বেলায় সহজ সোজা বাক্য এবং স্থপতি বিদ্যানুসারে নির্মিত বাক্য দুটোতেই দক্ষতা আসে। লম্বা জটিল শব্দ, ছোটো সংক্ষিপ্ত শব্দ উভয়ই থাকে। North Atlantic Treaty Organisation ও NATO। Dehydrogenated formyl alcohol ও Formaldehyde। উঁচুমানের যুক্তিসঙ্গত কথোপকথনের আনুষঙ্গিক এই শব্দগুলি।

খণ্ডের সঙ্গে সমগ্রের সম্পর্ক আর একটা বৈপরীত্য। যে কোন

বচন বা কথোপকথনের সমগ্রতা আছে। এই সমগ্রতার পুনরাবর্তক খণ্ডগুলি একত্র শৃঙ্খলশ্রেণীতে সংবদ্ধ থাকে। এটা লিখিতভাবে দেখানো যায়। এই বৈপরীত্যের দুটো দিকের চর্চা করা যায়। ফলও বিপরীত হয়। শব্দকোষে সংক্ষিপ্ত পদ্যাংশের সংখ্যা বেশী। মৌলিক শব্দ থেকে এদের অর্থের অনুমান করা সহজ নয়। পদযোজনায় প্রতিশব্দের সংখ্যা বেশী। প্রতিশব্দের মধ্যে ইচ্ছানুসারে পার্থক্য দেখানো যায়। Hierarchy কিন্তু বলা চলে না। আমাদের মানদণ্ডের কোনো এক দিক ভারী নয়। সমানভাবে মনোনীত পরিসর বাড়িয়ে দিয়ে চলে স্থায়িত্ব বা দৃঢ়তা থেকে বিশ্বস্ততা পর্যন্ত। খণ্ডের বেলা যা সমগ্রের বেলাও তাই।

আর একটা বৈপরীত্যকে open এবং closure—খোলা ও বন্ধ ভাব—বলেছি। বন্ধভাব মানে ভাষার ব্যবহারে ঐকিকতা। উপভাষার বিভিন্ন রূপের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য হয়। সুবিধা অসুবিধা বুঝে এই সাম্যভাব স্থাপন হয়। ভাষা খোলা থাকে যখন অন্য ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করার খাতিরে খণ্ড সমান করা হয় এবং বৈষম্যও সমানভাবে দেখানো হয়। যে ভাষায় গদ্য সব কাজের উপযুক্ত নয় সেই ভাষা খোলা এবং একরকম গদ্যহীন। যে ভাষায় গদ্য অন্য ভাষায় সহজে ভাষান্তর করা যায় না আঞ্চলিক বা পেশাগত প্রয়োজনে, সেটা খোলা নয়। এই খোলা ও বন্ধ ভাবের ওপর নির্ভর করে অখ্যাত গদ্যের রুচিহীনতা, স্বাদশূন্যতা ও অস্তিত্ব-হীনতা। রীতির শাসন থেকে মুক্তভাবও। Kant "জানতেন ঐক্যের দিকে যৌক্তিকতা এগিয়ে যায় বৈপরীত্যের ভিতর দিয়ে।

ভাষার সমতা

যন্ত্রপাতির কথা যখন বলা হয় তখন নির্ধারিত ছাঁচে নির্মাণ করার কথা ওঠে। যন্ত্রপাতি একই রকম বানানো হবে এবং একই দরে পাওয়া যাবে আশা করে থাকি। সব কাঁচি কাটবে। সব চাকা ঘুরবে। সব কলম লিখবে। সব ঘড়ি সময় দেবে। নির্ধারিত ছাঁচে নির্মাণ করার প্রয়োজন কম হয় যেখানে কোনো যন্ত্রপাতি কমসংখ্যক লোক ব্যবহার করে। কিন্তু বহু লোকের কাজে নিত্য যে যন্ত্রপাতি লাগে তার নির্মাণ একই রকম হলে সুবিধা হয়।

ভাষাকে যন্ত্রপাতি হিসাবে দেখা হয় যখন ভাষার সমতার কথা বলি। বার্তা দেওয়া নেওয়ার যন্ত্র। সংবাদ দেওযা নেওয়ার উপায়। সমতা আনতে হলে কী কী সমস্যা হয় আলোচনা করা হবে। সমরূপতার কথা উঠবে। কার্য্যকরিতার কথা উঠবে। নৈতিক একটা প্রশ্নও উঠবে যখন ভাষাবিষয়ক নিয়মে একরূপ আনার প্রচেষ্টা বিবেচিত ভাবে করা হয়।

এখানে কিন্তু শব্দপ্রণালী ছাড়া কোন কথা আলোচিত হবে না। ব্যাকরণ বা গঠন আপাতত বাদই দেওয়া যাক।

কার্যকারিতা

কেউ যেন মনে না করেন সব ভাষার গঠন বা প্রণালী একই রকম। অভিরুচি থাকে। শব্দ ও প্রণালী মনোনীত করা হয় কার্যকরিতা দেখে। তবে শব্দ বা প্রণালীর কার্যকরিতা আমরা কোন রেখাদণ্ড অনুসারে চিহ্নিত করতে পারি না। একই শব্দ

একাধিক অবস্থাতে একাধিক ভাবে কাজ করতে পারে। ফলপ্রদ সব অবস্থাতে সমান নাও হতে পারে। কী বিধি অনুসারে শব্দ নির্বাচন করা হবে কোন উদ্দেশ্যের জন্য তা দেখা দরকার। শব্দ-রাশিতে শব্দসংখ্যা কম বা বেশী থাকতে পারে। রূপ বা প্রণালী-পুঞ্জের বেলাও তাই। রেখাদণ্ডে আমাদের প্রয়োজন নেই। কার্যকরিতা তুলনা করে দেখার উপায় চাই।

ইংরেজীতে "vegetable" একটা লম্বা কথা। তাই বলে আমরা কি "veg" বলি? "veg" লম্বা নয় বটে কিন্তু তার ব্যাখ্যা লম্বা। ছোটো রূপ লম্বা রূপের চেয়ে কার্যকরী হয় যখন লম্বা রূপ পরিচিত এবং ছোটো করার পদ্ধতিও পরিচিত—অর্থাৎ কথা বলার সময় যে গদ্যাংশের উপর জোর দেওয়া হয় সেই অংশটুকু উচ্চারিত করে বাকিটা ছেড়ে দেওয়া। এই বিধি অনুসারে যদি লম্বা কথা ছোটো করা হয় ছোটো রূপ লম্বা রূপের চেয়ে সুবিধাজনক হবে। এই ধরণের কার্যকরিতাকে বলা হয় "concision" বা "সংক্ষেপ করা"।

কার্যকরিতার অন্য দিক আছে। "Veg"এর মত ছোটো শব্দ কানে নাও যেতে পারে নানা কারণে ফোনে কথা বলতে হলে। পুনরায় বলতে হয়। "Vegetable" লম্বা বলেই কানে না যাওয়ার সম্ভাবনা কম। আগের অংশ "veg" যদি কানে না যায় শেষ অংশ "etables" যাবেই এবং পুরো কথাটা কী অনুমান করা কঠিন হবে না। বাক্য প্রসঙ্গে শব্দটা ধরা সহজ হয়। এই গুণকে বলা হয় "redundancy" অর্থাৎ আধিক্য বা অতিরিক্ততা। বাক্যের অর্থ সমর্থন পায়। Self-confirmation'ও বলা চলে। অর্থাৎ আত্মসমর্থন।

Frequency বা পুনঃ পুনঃ সংঘটনেরও দুটি প্রকার দেখা যায়। একটা হচ্ছে text frequency। মূল বচনে বা গ্রন্থাংশে একটা শব্দ বা পদরূপ বারবার ব্যবহার হতে পারে। "Set" শব্দটা ৪৫টি বার

দেখা দিতে পারে ৫০০০ শব্দের মধ্যে। "Form" শব্দটা হয়ত ৬২ বার পাওয়া যাবে।

"List frequency" পুনঃ পুনঃ সংঘটনের অন্য এক প্রকার! বিভিন্ন শব্দে সামনে হয়ত "set" কথাটা ৩৫ বার ব্যবহার করা হয় একই মূল বচনে বা পদাংশে। এবং "form" কথাটা বিভিন্ন শব্দের সামনে ৩৯ বার হয়ত ব্যবহার হয়ে থাকবে।

শব্দ বা পদ খুবই পরিচিত হতে পারে। কম পরিচিতও হতে পারে। "List frequency" বেশী থাকলে খুব পরিচিত হয়। কম থাকলে কম পরিচিত হয়। যে শব্দ কম পরিচিত সেই শব্দ সাধু ভাষার শব্দ ও "learned" পর্যায় পড়ে। পরিচিত শব্দ অস্পষ্ট একটা জলীয় ধারণার নামকরণে বা ব্যাখ্যায় বেশী কার্যকরী। নিশ্চিত ধারণার নামকরণে কম পরিচিত বা "learned" শব্দ ব্যবহারে কার্যকরিতা বাড়ে।

"List frequency"তে যে শব্দ বেশী দেখা যায় তার সম্পর্কও বেশী। সম্পর্কের যোগাযোগের কী কাজ এই ক্ষেত্রে দেখা যাক। পরিচিত শব্দ দিয়ে নিশ্চিত ধারণার নামকরণ যদি হয় তাহলে বিপদ আছে। অপ্রাসঙ্গিকতায় গিয়ে পড়তে পারি। অপরিচিত বা সাধু শব্দের সম্পর্কের সংখ্যা কম বলে অপ্রাসঙ্গিকতায় পড়ার ভয় কম। এই ধরণের শব্দ অনেক বেশী নির্দিষ্টতার সঙ্গে ইচ্ছানুযায়ী প্রয়োগ করতে পারা যায়।

সমতার প্রশ্ন

ভাষার মধ্যে সমতা আনার প্রচেষ্টা দু'রকমের। যাদের একই ভাষা এক জাতি বলে তারা নিজেদের পরিচয় দেয়, তবে সেই জাতির সকলেই একই রূপ একই অর্থে প্রয়োগ সব সময় করে না। ভাষা বা dialect থাকলে এই অবস্থা সাধারণত হয়। উপভাষা কম কি বেশী

সংখ্যায় সব ভাষারই থাকে। তবে একই রকম ভাবে মূল ভাষাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করা হয় না। ফরাসীর উপভাষার সংখ্যা জার্মানের চেয়ে কম। উপভাষার অসামঞ্জস্যের কারণ হতে পারে অসমান আর্থিক বা সামাজিক অবস্থা, তবে এর আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। ভাষার সঙ্গে উপভাষার তুলনা করা আমাদের কাজ। পদ ও শব্দের ব্যবহারে খুব বেশী তফাৎ যদি না থাকে তাহলে মূল ভাষাকে বন্ধ বা closed বলা চলে।

একটি জাতি একই ভাষী বলে তার পরিচয় হয়ত দেয় কিন্তু কাজের বেলায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অন্য ভাষা ব্যবহার করে। ইতিহাসে এই রকম ব্যাপার অনেক বার ঘটেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত মার্কিনী বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নবিদ্যা পড়ানো হত জার্মান পাঠ্যপুস্তক থেকে। যাঁরা রসায়নবিদ্যা নিয়ে চর্চা করতেন তাঁদের জার্মান ভাষার ওপর দখল রাখা দরকার ছিল।

দ্বিতীয় এক ভাষা প্রয়োগ করার দরকার হয় না বিশেষ কাজের বেলায় এমন সচরাচর দেখা যায় না। প্রশ্ন ওঠে নিজের ভাষার সঙ্গে দ্বিতীয় ভাষার মিল কতখানি? গঠনে ও শব্দার্থপ্রণালীতেও এই মিল বা অমিলের পরিমাণ বুঝে আমরা বলতে পারি মূল ভাষা কী পরিমাণে open বা closed। Open না লিখে তার জায়গায় "intra-linguistic" বসাতে পারা যায় এবং "closed" না লিখে তার জায়গায় "inter-linguistic" বসানো যায়। "Intra-linguistic" হলে মিল হয় বাইরের ভাষার সঙ্গে। "Inter-linguistic" হলে মিল হয় ভিতরের বা উপভাষার সঙ্গে। সমতার অভাব ধরা পড়ে নানা রকম ভাবে।

(১) একটা সমাজের ভিতরকার ভাষায় অনেক সময় সমতা থাকে না।

(২) সমতা সীমাবদ্ধ থাকতে পারে বিশেষ ক্ষেত্রে।

(৩) সমতা সীমাবদ্ধ থাকতে পারে একাধিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে।

ধারের উৎপত্তিস্থান

ভাষার বেলা যাকে "borrowing" বলা হয় তাকে ঠিক ঋণ বলা চলে না। উত্তরাধিকারী হিসাবে পাই। শোধ করতে হয় না। বর্তমানে কী শব্দ বা পদ তা থেকে নিয়ে কাজে লাগানো হয় তার কথা বলা হবে। বলার দরকার নেই অতীতে কী হয়েছিল। এক সময় ইংরেজী অনেক কিছু ডেনমার্কের ভাষা থেকে উদ্ধৃত করত। তবে এখন আর কিছুই নেয় না। Danish এখন ইংরেজীর ধারের উৎপত্তিস্থান আর নয়।

ধারের উৎপত্তিস্থান একাধিক হয় কখনও কখনও। সারিবদ্ধ হয়ে একই উৎসে মিশে যায়। ধারের প্রধান উৎপত্তিস্থান ইংরেজীর বেলায় ফরাসী ল্যাটিন ও গ্রীক। ফরাসী নিজে ল্যাটিন ও গ্রীক থেকে প্রচুর গ্রহণ করেছে। ল্যাটিনও প্রচুর নিয়েছে গ্রীক থেকে। কাজেই এই তিনটি উৎপত্তিস্থানের মধ্যে সম্পর্ক আছে। ধারের উৎপত্তিস্থান সমান্তরাল রেখার মত সাজানো থাকতে পারে। ইন্দোনেশিয়ান ভাষা ধার করে ইংরেজী, ডাচ (Dutch) ও ফরাসী থেকে। জার্মান তো ইংরেজী বা ফরাসী থেকে ধার করে না।

ধারের নানা উৎপত্তিস্থানের মধ্যে প্রায় দেখা যায় সম্পর্ক নেই। একেবারে বিপরীত ধরণের ভাষা হতে পারে। ক্ল্যাসিকাল চীনা-ভাষা থেকে জাপানীও ধার করে থাকে। ইংরেজী থেকেও শব্দ নেয়। আধুনিক ভারতীয় ভাষার অবস্থা অনেকটা এই রকম। প্রধান ধারের উৎপত্তিস্থান তিনটি—সংস্কৃত ও আরবী বা ফারসী এবং ইংরেজী। উৎপত্তিস্থানের মধ্যে এত অমিল থাকলে টান্ টান্ ভাব

অনিবার্য। এই টান্ টান্ ভাব কমানো যায় নানা উপায়ে। একটি উৎস ছেড়ে দিতে পারা যায়। তুর্কি ভাষা ছেড়ে দিয়েছে আরবী ও ফারসী। আর শব্দ ধার করে না ঐ দুটো ভাষা থেকে। আগে থেকে যে সব শব্দ নেওয়া হয়েছে সেগুলি রেখেছে অবশ্য। টান্ টান্ ভাব কমানোর আর একটা উপায় আছে। ধার করা শব্দগুলি এমন ভাবে ব্যবহার করা চলে যাতে মিল থাকে অন্য উৎস থেকে নেওয়া শব্দের ব্যবহারের সঙ্গে। ক্ল্যাসিকাল ভাষা থেকে উদ্ধৃত শব্দ নিয়ে নতুন শব্দ তৈরী হয় জার্মানে ও জাপানীতে। ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে শব্দ বা শব্দসমষ্টি ল্যাটিন বা গ্রীক উৎস থেকে এসে প্রচলিত হয়ে আধুনিক ভাষার অঙ্গ হয়েছে। নতুন রীতি বা স্টাইল হিসাবেও একাধিক ধারের উৎপত্তিস্থান থেকে গৃহীত শব্দ চালানো যায়। জাপানীতে এটা করা হয়। ক্ল্যাসিকাল চীনের লিপির সঙ্গে ইউরোপীয় শব্দ বা ধ্বনি রূপ মিলিয়ে সাদৃশীকরণের পরে এই শব্দ জাপানী শব্দের মত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইংরেজীতে এই ধরণের ব্যাপার করলে কেমন হবে? "Artificial satellite" লিখে যদি কেউ উচ্চারণ করে "sputnik"? লিখিত শব্দ ও উচ্চারিত শব্দের মধ্যে মিল থাকে না।

উপভাষা

ভাষার পরিধির মধ্যে কম কি বেশী সংখ্যক উপভাষা (dialect) থাকে। যে উপভাষা প্রধান তার ওপরে ভাষার সমতা স্থাপন করা যায়, তবে এমন হতে পারে যে, কোনো উপভাষাই প্রধান নয়। Luther-এর সময় জার্মানে পাঁচটি উপভাষা ছিল এবং সবই এক রকম সমান। Luther নির্বাচন করলেন যে উপভাষা তার মধ্যে একতার পরিমাণ বেশী। এর ফলে এই উপভাষা প্রাধান্য লাভ করল। অনেক সময়

মন সচেতন থাকে না এই সব সম্বন্ধে। এক বছর চর্চা করতে হল Clement Dukeকে Southern Rhodesiaতে জানবার জন্য যে, Shonai নামক একটি চলতি ভাষাকে লিখিত একীভূত ভাষায় পরিণত করা যায়। তাঁকে দেখাতে হল এই কাজে সাহায্য পাওয়া যাবে দুটি উপভাষা থেকে—Karanga এবং Zezuru। এদের সঙ্গে Shonai-এর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

একাধিক উপভাষার মধ্যে একটিই অনেক সময় সকলেরই জানা থাকে ও ব্যবহার করা হয় কোনো এক বিশেষ ক্ষেত্রে। সাহিত্যে হয়ত চলে বা বক্তৃতায়। এই রকম হলে "diglossia" বলা হয়। এটা আরবী ভাষায় দেখা যায়। সাধু বা standard আরবী ব্যবহার হয় আরব জগতের সব অঞ্চলে। ক্ল্যাসিকাল ভাষার সঙ্গে এর বেশ মিল আছে। তবে নানা উপভাষায় কথাবার্তা চলে শিক্ষিত সমাজে। বিভিন্ন আরব দেশে বিভিন্ন উপভাষা আছে—ইরাক, সীরিয়া, মিশর ও মগরেবে অর্থাৎ মরক্কো, আলজিরিয়া, টিউনিসে। এই উপভাষাগুলি কালক্রমে পুরাপুরি পূর্ণ ভাষা হয়ে উঠতে পারে রাজনৈতিক স্বতন্ত্রতার ফলে। যেমন ল্যাটিনের উৎস থেকে গড়ে উঠেছে ফরাসী, স্প্যানিশ ও ইতালিয়ান। অথবা উপভাষার মধ্যে একটাই প্রাধান্য লাভ করতে পারে। চীনে এই রকম হচ্ছে মনে হয়। পিকিং-এর উপভাষাকে অন্য সব উপভাষার ওপরে তুলতে একটা প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। এমনও তো দেখা যায় অনির্দিষ্ট কাল ধরে একাধিক উপভাষা পাশাপাশি থাকে সমতা রেখে। সুইটজারল্যাণ্ডে Swiss জার্মানের পাশে সাধু বা High জার্মান রয়েছে। পরস্পরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। যে যার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে আসছে বহু কাল ধরে।

একই ভাষার পরিধিতে একাধিক সাধু উপভাষা থাকতে পারে

এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অপর্যাপ্ত উপভাষা। এই রকম অবস্থা কিছুদিন থেকে দেখা যাচ্ছে বাংলা দেশে। দুটি সাধু উপভাষা আছে। একটা লিখিত এবং অন্যটা স্বতন্ত্র অঞ্চলের চলতি ভাষার ওপরে স্থাপিত। এই দুটির মাঝখানে আরো কয়েকটা উপভাষা বেশ কিছু স্থিতি লাভ করেছে। বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। সাধু ভাষাটি আর চালু নেই।

ভাষা

একটিমাত্র সাধারণ বা common ভাষা থাকে না অনেক সময়। ফিনল্যাণ্ডে দেখা যায় শতকরা ৯০ জন ফিনিশ বলে এবং বাকি ৯ জন বলে সুইডিশ। অথচ সুইডিশ সরকারী ভাষা ছিল গত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। Swedish এখনও সর্বত্র চলে নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ডে। সুইডিশ এখন দ্বিতীয় সরকারী ভাষা এবং শহরে যারা থাকে তারা প্রায় সবাই দ্বৈভাষিক। সুইটজারল্যাণ্ডে শতকরা প্রায় ৭২ জন জার্মান বলে, কিছু বেশী শতকরা ২০ জন ফরাসী বলে এবং কিছু কম শতকরা ৬ জন বলে ইতালিয়ান। ফরাসী বলা হয় যেমন বলা হয় ফ্রান্সে। ইতালিয়ান বলা হয় যেমন বলা হয় ইতালীতে। ফ্রান্স ও ইতালী শক্তিশালী প্রতিবেশী। তাদেরকে লোকে শ্রদ্ধা করে। আনুষ্ঠানিক কার্যে বিশুদ্ধ জার্মান বলা হয়, তবে সাধারণভাবে জার্মানের একটা উপভাষা চলে। এর ফলে সুইটজারল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ভাষা ফরাসী। জার্মান নয়। ঐতিহাসিক কারণে সুইটজারল্যাণ্ডের ওপরে ফ্রান্সের প্রভাব দীর্ঘদিনের।

একটা ভাষা পুরোপুরি ভাবে কার্যকরী বা উপযুক্ত না হলেও সাধারণভাবে চলতে পারে। ইংরেজী অন্য ভাষার চেয়ে বেশী বলা হয় ফিলিপাইনসের সর্বত্র এবং Class III থেকে ইংরেজী পড়াশুনার

একমাত্র মাধ্যম। শতকরা ৩৮ জন নাক ইংরেজী বলে এবং সাধারণ কাজে ব্যবহার করে। সরকারী আদমসুমারিতে তাই দেখা যায়। অথচ ইংরেজী সেখানে বিদেশী ভাষা। বিদেশীরা বলত প্রথমে। অন্য কেউ জানত না। তারপরে দেখা গেল উঁচু শ্রেণীর শিক্ষিত যারা তারা সবাই বলছে। তাদের আসল ভাষা হয়ে উঠল ইংরেজী। ক্রমে ক্রমে ইংরেজী সেখানকার জনসাধারণেরও ভাষা হল। এখন গণভাষায় পরিণত হচ্ছে। দেশী ভাষা এখনও চলে অবশ্য, তবে আরও নিচু শ্রেণীর মধ্যে। ইন্দোনেসিয়াতে কমসংখ্যক শিক্ষিত লোক বলত মালয়ভাষা প্রথমে। তারা প্রধান ও ক্ষমতাশালী। শহরে বাস করে এবং সর্বত্র সঞ্চলনশীল।

একাধিক ভাষা সাধারণ বা common ভাষা হতে পারে। সব ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সমান কার্যকরী হবে এমন কোনো কথা নেই। এক একটি উপভাষা এক একটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হতে পারে এবং অন্য ক্ষেত্রে কার্যকরী। Tagalog বলতে হয় ফিলিপাইনসের রাজধানীতে। শহরের আশেপাশেও Tagalog চলে। স্কুলে স্প্যানিশও শেখানো হয়। স্প্যানিশ যারা বলে তাদের সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশী নয়, তবু স্প্যানিশ শিখতে হয় ঐতিহাসিক কারণে। ভারতের অবস্থা অনুরূপ। উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংরেজী লাগে। চলে সরকারী কাজে এবং ব্যবসায়। ভারতে শতকরা ৭ জনের কম ইংরেজী ব্যবহার করতে জানে। হিন্দী চলে সমাজের নিম্নস্তরে এবং সামরিক শিবিরে। হাট বাজারে তীর্থস্থানেও হিন্দী চলে। উত্তর ভারতে হিন্দী বিস্তৃত এক অঞ্চলে বলা হয়। ধর্মীয় আচার বিচারে হিন্দুরা সবাই সংস্কৃত ব্যবহার করে থাকে, যদিও যারা সংস্কৃত বোঝে তাদের সংখ্যা দু' এক হাজারের বেশী নয়। তামিল ও বাংলা নিজস্ব অঞ্চলের বাইরেও চলে—পূর্ব দিকে বাংলা, দক্ষিণদিকে তামিল। এমন কি

ভারতের বাইরেও এই দুটি ভাষা চলে। তামিল বলা হয় সিংহলে। বাংলা বলা হয় পূর্ব পাকিস্থানে বা বর্তমান বাংলাদেশে। উর্দুকে যদি স্বতন্ত্র ভাষা বলে গণ্য করা হয় তাহলে মনে রাখতে হবে সংস্কৃতের মতন উর্দু আনুষ্ঠানিক বা formal কাজের বেলা ব্যবহার হয়। শতকরা প্রায় দশজন উর্দু জানে। তারা সকলেই অন্য ভাষাও জানে। উর্দু ভারতের বাইরে পশ্চিম পাকিস্থানে চলে। এই ৬টি ভাষা বিভিন্ন ভাবে সাধারণ বা common ভাষার কাজ করে। আরো ৮টি ভাষা স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলে সরকারী স্বীকৃতি পেয়েছে। কাজেই বলতে পারা যায় ভারতে ১৪টি সাধারণ বা common ভাষা আছে। এই ভাষাগুলি লেখা হয় ১১টি বিভিন্ন বর্ণলিপিতে।

নানা উপায়ে এই অবস্থা সংশোধন করা যায়। ভাষাগুলির মধ্যে কোনো একটা প্রাধান্য লাভ করতে পারে। মনে হয় ফিলিপাইনসে এরই চেষ্টা চলছে। দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক কারণে দেশ ভেঙে গিয়ে এক একটা ভাষার স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলে স্বতন্ত্র এক একটা রাষ্ট্র গঠন হতে পারে। Hapsburg Empire থেকে বেরিয়ে এলো অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও চেকোস্লোভাকিয়া। তৃতীয় এক উপায় সুইটজারল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ডে দেখা যায়। সেই দুটি দেশে একাধিক ভাষা ব্যবহার করার রেওয়াজ স্থায়িত্ব পেয়েছে।

বিজ্ঞানের জন্য একটা common বা সাধারণ ভাষা রাখবার সমস্যা একটু আলাদা রকমের। যদিও নানা বিজ্ঞানঘটিত ঐতিহ্য এক হয়ে গেছে এই একতার রূপ খুব স্পষ্ট ভাবে নির্দিষ্ট করা হয়নি এখনও। উঁচু দরের বৈজ্ঞানিক চর্চা করা হয় প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থাতে আজও। এক এক দল সৃষ্টিশীল শিল্পী এই রকম চর্চা করতে বাধ্য। এমন সব ভাষায় এঁরা কাজ করে গেছেন যে তাঁদের কৃতিত্বের পরিচয় সহজে পাওয়া যায়নি। বৈজ্ঞানিক ও সৃষ্টিশীল প্রতিভার অপচয়ও

ঘটেছে কোন ভাষায় চর্চার ফল প্রকাশ করা হবে স্থির নেই বলে। অল্প পরিচিত ভাষায় উল্লেখযোগ্য কাজ তো হয়েছেই। পোলাণ্ডের ভাষায় যুক্তিবাদ চর্চা দার্শনিকরা করেছেন এবং চেক ভাষায ভাষাতত্ত্ব চর্চা ভাষাতত্ত্ব বিজ্ঞানীরাও করেছেন দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানে যে যুগ গেল সেই যুগে। কোনো একটা বিশ্বব্যাপী ভাষা বা World Language নিয়ে কাজ করলে কিছু কৃতিত্বের পরিচয় জানা যায় অবিলম্বে এবং তার ফলে সকলের জ্ঞানচর্চা ত্বরান্বিত হয়।

এর প্রতিকার দুটি। যে ভাষায় প্রচুর মূল্যবান কাজ হয় সেই ভাষা শিখতে সকলেই বাধ্য। ভাষাটা অল্পপরিচিত থাকে না। সুতরাং কাজের পরিমাণ ও প্রচেষ্টা বাড়াতে হয়। রাশিয়াতে এই প্রচেষ্টা চলছে। অন্য এক প্রতিকার হচ্ছে বৈজ্ঞানিকদের দ্বৈভাষিকতা। সমান দক্ষতার সঙ্গে একাধিক ভাষায় যদি বৈজ্ঞানিকরা লেখেন কোনো অসুবিধা থাকবে না। আজকাল ইউরোপের উত্তর দিকে অনেকটা এই রকম হয়েছে। উঁচু মানের চর্চার ফল আর ওলন্দাজ (Dutch) কি দিনেমার (Danish) ভাষায় প্রকাশ করা হয় না অথচ এক সময় এই দুটি ভাষায় অনেক মূল্যবান কাজ হয়েছে। পরিবর্তক উপায়ের মধ্যে আসে বিভিন্ন বর্ণলিপি, ধারের উৎপত্তিস্থান ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিকরা চাইবেন প্রধান বৈজ্ঞানিক ভাষার সহিত মিল রাখতে। যা করলে এই মিল বাড়বে তাই সমর্থন করবেন। বিজ্ঞানচর্চা একমাত্র চর্চা নয় অবশ্য। এতো মিল দেখা যায় না অন্য বিষয়ে যেমন মানবধর্ম বিজ্ঞানে। অনেক কথা ভাবতে হয়—সমার্জের মধ্যে শ্রেণী বা আঞ্চলিক সাদৃশ্য, একই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থাকার দরুণ বন্ধু ও প্রতিবেশী দেশের সহিত সম্পর্ক, পুরুষানুক্রমিক একতা এবং ঐতিহ্য।

বিজ্ঞানের একতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। বিজ্ঞানের সাধনা কি একটি-

মাত্র সাধনা না একাধিক সাধনার মিশ্র প্রচেষ্টা ? প্রণালী সমষ্টি বা বা বাক্য সমষ্টি বা দৃষ্টিভঙ্গীর সমষ্টি যার স্থায়ী মূল্য আছে ? বিজ্ঞান বলতে যদি এই বোঝায় তাহলে প্রশ্নের উত্তর "না"। কিন্তু উত্তর হবে "হুঁ" যদি বিজ্ঞান বলতে যা বোঝায় তা অস্পষ্ট হয়। দ্ব্যর্থবোধকতা সবচেয়ে কম গণিতের বেলায়। সব চেয়ে বেশী ধর্মীয় চর্চায়। কোনো বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষে একটা ভাষা যথেষ্ট নয় নয় আজকাল হিন্দু ধর্মের আলোচনায়ও। সংস্কৃত তাকে জানতে হবেই। তার সহিত হিন্দী ও ইংরেজীও দরকার হয়। ভাষা খোলা থাকবে না বন্ধ হবে—এই নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। মূল্যায়ন করার মানদণ্ড আছে কি নেই তারও কথা উঠবে। একই মানদণ্ড সব ভাষার বেলায় প্রয়োগ করা যায় কিনা তার কথাও উঠবে।

সর্ত্ত

সমতা আনা হয় ভাষার মধ্যে দুটি পদক্ষেপে। অনুকরণ করার মতন একটা আদর্শ ছাঁচ বা কাঠামো তৈরী হলে পরে সেটাকে প্রাধান্য দিতে হবে অন্য সব নক্শার ওপরে।

এই রকম আদর্শ ছাঁচ বা কাঠামো কেমন হবে ? শ্রোতা ও পাঠকের আগ্রহ এবং ভক্তি জাগায় এমন একটা ভাষাপ্রণালী বা body of discourse। মুখে যখন কথা বলা হয় যাদের ভাষা তাদের উপস্থিতি চাই। লিখিত কথা পাঠক হাতের কাছে পাবে। পাঠকের উপস্থিত থাকার দরকার নেই। লিখিত কথা এবং মুখের কথা—দুটোরই বেলায়—ভাষার গঠনপ্রণালী অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট ও অবান্তর কল্পনা দিয়ে ভর্তি হতে পারে। একটা সুচিন্তিত কাঠামো তৈরী করা যায় এবং সেটাকে অনুকরণ করতে জনসাধারণকে অনুরোধও করা যায়। এমন কাঠামো বেসরকারী ভাবেও পেশ করা যায়। সরকারী

নির্দেশেও কাঠামো তৈরী করা যায় এবং মেনে নিতে বাধ্য করা যায় পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা করে।

সমতা আনার যে উপায় অপেক্ষাকৃত সমর্থন পায় সেটা হবে সরকারী আদেশে প্রকাশ করা বইপত্র। স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া থাকে কী করে কী লিখতে হবে, কোন উৎপত্তি স্থান থেকে শব্দ ধার করা হবে, উপভাষার সম্বন্ধে কী কী ব্যবস্থা হয়েছে ইত্যাদি। তবে সরকারী আদেশে সুপরিকল্পিত সাহিত্য গড়া যায় কিনা একটু ভেবে দেখা দরকার। এর উপায় একাধিক ও বিভিন্ন।

কয়েকটামাত্র উপায় উল্লেখ করা যাবে এখানে। প্রত্যেকটাই সীমাবদ্ধ এবং এক একটা সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

(১) শব্দ সমর্থন : কোন কোন শব্দ কী কী ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে তার নির্দেশ দেওয়া হয়। যাঁরা শব্দ নির্বাচনের দায়িত্ব নেন তাঁরা শব্দের ব্যবহার দেখাতে পারেন। Text বা মূল বচন লিখে। Approved terminology তৈরী হয় এইরকম ভাবে।

(২) পুরস্কার : প্রশংসনীয় কাজের জন্য সম্মান দেখানো যায় নানা ভাবে। আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা যায়।

(৩) প্রতিযোগিতা : উপযুক্ত পুরস্কারের ব্যবস্থা করে প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়া লোভনীয় করতে পারা যায়।

(৪) লেখক নির্বাচন : বিশেষ লেখার জন্য বিশেষ লেখক বা অনুবাদক নির্বাচন করে তাঁর ওপরে ভার দিতে পারা যায়। কাজ কী রকম হয়েছে বিচার করে দেখতে পারেন অভিজ্ঞ যাঁরা।

(৫) Subsidised self-help : যারা বই পড়তে চায় এবং যারা বই কিনতে পারে তাদের মধ্যে বরাবর আর্থিক একটা ব্যবধান থাকে। ব্যবধানটা কমাতে পারা যায়। বই যাতে কম দামে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা যায়। প্রকাশকদের নানাভাবে

পরামর্শ এবং সাহায্য দিতে পারা যায়। কম সুদে অর্থ ধার দেওয়া চলে।

(৬) State enterprise বা রাষ্ট্রিক প্রচেষ্টা: বই যদি না পড়া হয় সেই বই থেকে কোন উপকার পাওয়া যায় না। সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ। এই রকম বই ঐতিহাসিক কিম্বা সাংস্কৃতিক দলিল হয়ে পড়ে থাকে। প্রমাণ হয় শুধু যে এই ধরনের বই প্রকাশিত হয়েছে। সমতা আনার কোন সাহায্য হয় না।

সমস্যা দু'রকম। উঁচু মানের আদর্শের সাহিত্য সৃষ্টি এবং সেই আদর্শকে অন্যসব সাহিত্যের ওপরে প্রাধান্য দেওয়া। ঘোড়া জল পান করতে বাধ্য নয়। জোর করা চলে না। সাহিত্য যদি পাঠকের ভালো লাগে সে পড়বেই এবং তার আদর্শ আপনা-আপনি মেনে নেবে। তার ভালো লাগবে যদি সে সাহিত্যে পায় মানুষের যা যা প্রয়োজন। তাকে দিতে হবে সে মনে মনে যা চায় এবং তার সঙ্গে যে জ্ঞান তাকে উপকৃত করবে। এমন ভাবে দিতে হবে যে পাঠক সহজে বুঝে নিয়ে গ্রহণ করবে। তার ভালো যেন লাগে পড়তে ও জানতে। জ্ঞান ও ভাব নতুন ধরণের পরিবেশন চায়। তবেই নতুন রুচি সৃষ্টি হবে।

চাহিদা অবশ্য নানা ভাবে বাড়াতে পারা যায়। নতুন চাহিদাও সৃষ্টি করা যায়। রাষ্ট্রিক প্রচেষ্টা এই ক্ষেত্রে ফলোৎপাদন করতে পারে। শিল্পবিজ্ঞানের নানা শাখা সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রয়োজন বেড়ে চলবে শিল্পবিস্তারের সাথে সাথে। গণতন্ত্র স্থাপন করার সময় তুরস্ক রাজ্যে এমন এক রাজনৈতিক সাহিত্য দরকার হল যা সকলেরই বোধগম্য। আর্থিক প্রশ্নের বেলায়ও তাই। তুরস্ক ভাষার স্বীয় রূপ ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন হল। আরবী এবং ফারসী শেখার জন্য অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দিল রাষ্ট্র। ঘোষণা করা হল যে আরবী

বা ফারসী বর্ণলিপি প্রকাশ্যে ব্যবহার করা অপরাধ। রোমান বর্ণলিপির ব্যবহার বেড়ে গেল।

চাহিদা বাড়ানো বৃথা যদি আদর্শ কাঠামো বা ছাঁচ না থাকে। গাজর না দেখিয়ে যদি কেবল লাঠি মারা হয় গাধা বিভ্রান্ত হয়ে নানা দিকে কেবল ছুটাছুটি করবে। শিক্ষার মাধ্যম ও রাষ্ট্রিক কাজের মাধ্যম হিন্দী হলে যে হিন্দীতে উন্নত সাহিত্য সৃষ্টি হবে এমন কোনো কথা নেই। উঁচু মানের সাহিত্যের দাম অনেক। অধ্যবসায়, পরিশ্রম, প্রতিভা, সময়, অর্থ সবই লাগে প্রচুর পরিমাণে। যে সাহিত্যের বিস্তার বেশী তার অর্থানুকূল্য (subsidy) সচরাচর লাগে না। তবে বিস্তার ও উঁচু মানের মধ্যে পার্থক্য রাখতে হবে।

খামখেয়ালীভাবে দিক পরিবর্তনে ভাষাগুলোর মধ্যে সম্পর্ক বদলে যেতে পারে যেখানে একাধিক ভাষার সমাবেশ হয়েছে। পরিবর্তন দু'রকম হতে পারে—convergent বা divergent, কেন্দ্রাভিসারী বা দূরাপসরণশীল। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় যে পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে সেটা কেন্দ্রাভিসারী। নিত্য নতুন বৈজ্ঞানিক শব্দ প্রত্যেক ভাষায় এসে পড়ছে। সেই শব্দ একই সব ভাষায়, এবং ইংরেজী থেকে নেওয়া। সংস্কৃত থেকে যে শব্দ উৎপন্ন হয়েছে এবং Technical Term হিসাবে চালানো হচ্ছে সেগুলি কিন্তু ততটা কেন্দ্রাভিসারী নয়। 'সূচনা' এবং 'ঘোষণা'—এই দুটি কথা সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন তদ্‌ভব শব্দ। একটা হিন্দীতে "notice" অর্থে ব্যবহার হয় এবং অপরটা ব্যবহার হয় বাঙলায় "notice" অর্থে। ফলে একটা divergence দেখা যাচ্ছে। শব্দের মধ্যে দূরাপসরণশীলতা আছে। সংস্কৃতে এই দুটির মানে এক। আলাদাভাবে ব্যবহার করা অর্থহীন। দূরাপসরণশীলতা বা divergence আরো বেশী দেখা যায় যেখানে হিন্দীর জন্য শব্দ সংস্কৃত থেকে না নিয়ে ঠেট থেকে

নেওয়া হয়। বা উর্দুর জন্য ফারসী বা আরবী থেকে নেওয়া হয়। বা তামিলের জন্য ক্ল্যাসিকাল তামিল থেকে। দেখা যাচ্ছে দূরাপসরণশীলতা বা divergence বেশী হয় যেখানে ইংরেজী ও সংস্কৃত থেকে ধার করা সম্বন্ধে আপত্তি থাকে।

ভাষার পরিকল্পনা কোনো রাষ্ট্র করতে বাধ্য নয়। জার্মানীতে রাষ্ট্র করে নি। করেছিল চার্চ। Luther এই প্রচেষ্টার প্রধান সাধক। এক দল লেখকও ভাষার মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারেন, যেমন প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর 'সবুজ পত্রে'র বন্ধুগণ বাঙ্‌লায় নূতনত্ব আনলেন। বৈজ্ঞানিকও পারেন। Linnaeus করলেন Botany বা উদ্ভিদ্‌বিদ্যার বেলায়। Linnaeus একজন সৃষ্টিশীল বিজ্ঞানী। যে "phonematic" না লিখে "phoneme" লেখে সেও ভাষার ব্যবহারে হাত চালাচ্ছে।

রাষ্ট্রভাষার একটা পরিকল্পনা করলেই যে সেই পরিকল্পনা সফল হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। বহুদিন ধরে নরওয়েতে রাষ্ট্র চলতি ভাষার নিন্দা করে non-Danish পদের পক্ষে প্রচার চালালেন কিন্তু তেমন কোনো ফল হয়নি। রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র। তা সত্ত্বেও। যেটুকু ফল হল সেটা অস্থায়ী। লোপ পেতে দেরী হল না। বেশী দিন চললও না। পাপুয়াতে লাটসাহেবের মতে চলতি ভাষায় বলা লজ্জাকর ব্যাপার। সেখানকার চলতি ভাষাকে বলা হয় Melanasian Pidgin। লাটসাহেব একেবারে তুলে দিতে চেষ্টা করলেন। উল্‌টো ফল হল। Melanesian Pidgin বিস্তার হল সর্বত্র এবং তার জোর খুব বেড়ে গেল। রাজধানী Port Moresbyতে যে ভাষা বলা হয় তার নাম Motu। Motu এমন এক ভাষা যার ব্যবহার দেখে লাটসাহেব আরো লজ্জা পেলেন। ইংরেজী বা অন্য কোনো সভ্য ভাষা চালু করতে পারলেন না Melanesian Pidgin ও Motuকে বাদ দিয়ে।

আয়ারল্যাণ্ডে যা হল তা বিখ্যাত। সে দেশে পুরাতন স্বদেশী Gaelic ভাষা চালাতে প্রচুর চেষ্টা হয়েছে কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ।

ভাষা পরিকল্পনার সফলতা নির্ভর করে আগে থেকে যে কাজ দেওয়া নেওয়ার ব্যবস্থা সমাজে আছে তার ওপরে। অর্থাৎ আগে থেকে ভৌতিক ও মানসিক দ্রব্যের দেওয়া নেওয়ার যেসব রাস্তা স্বীকৃত হয়েছে তাদের ওপর। কে কার সাথে অবাধে কথা বলে কি বলে না, তাতে খুব একটা বেশী কিছু এসে যায় না। দৈনন্দিন প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। যে ভাষা সব কাজে সব সময় লাগে তাকেও। সামাজিক উন্নতি হয় যখন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সহজে পাওয়া যায়। উপকারিতা থেকে আসে প্রতিপত্তি ও গৌরব। দেওয়া নেওয়ার সূত্রে যারা বাঁধা তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভক্তি ও সম্মান জাগে। Karl Deutsch তাদেরকে সমাজের সঞ্চলনশীল বা mobilised অংশ বলেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন কী করে সামাজিক সঞ্চলনশীলতা বা mobilisation অনুসারে ভাষার মূল্য ও তার পদরূপপ্রণালীর প্রকার পরিবর্তিত হয়।

অন্য একটি শব্দ দিয়ে এই পরিবর্তনের নামকরণ করলে বোধ হয় সুবিধা হবে। সেই শব্দটি সভ্যতা বা civilization। Karl Deutsch-এর বিবরণীতে রাষ্ট্রের কোনো প্রভুত্ব থাকে না রেডিও বা খবরের কাগজর বা প্রকাশনালয়ের ওপরে। এমন কি জনসাধারণকে একত্র করারও কোনো ব্যবস্থা নেই। কথা বলার অভ্যাস ও কথা শোনার অভ্যাস নিয়ে তিনি চিন্তিত। কাজের প্রসঙ্গে যে ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গড়ে ওঠে তিনি সেইটি দেখেন।

Motu প্রাধান্য লাভ করল পুলিশের ভাষা বলে। পুলিশ সমাজের চলনশীল অংশের মধ্যে একটা বড় অংশ। জনসাধারণ পুলিশের পরিচয় বেশী পায়। তাদের প্রভুত্বের। যাঁরা রাষ্ট্রের প্রধান

শাসনকর্তা তাঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ দুরূহ ব্যাপার। তাঁরা ইংরেজী বলেন। প্রভাবশালী বণিক, সৈনিক ও পুরোহিতদের ব্যবহারের ফলে বহুল ও বহুদূর প্রচলিত মালয় ভাষাকে জাভার ভাষা ও অন্যান্য ভাষার উপরে স্থান দিয়ে Bahasa Indonesia রূপে গ্রহণ করা হয়। যাতে প্রতিপত্তি বাড়ে লোকে নিশ্চয় তাই করতে চায়, কিন্তু প্রবেশাধিকার যদি না থাকে কেমন করে তা পারে? নির্ধারণের বিভিন্ন পদরূপপ্রণালী যদি প্রতিপত্তি ও প্রবেশাধিকার অনুসারে তালিকায় সাজানো হয় যাতে প্রতিপত্তি বাড়ে সেইটে লোকে বেছে নেবে।

ভাষা বদলানো বা সংশোধনের চেষ্টা সফল হবে যে পরিমাণে সেই চেষ্টা জনসাধারণের চলতি অভ্যাসের সঙ্গে মিলে যায়। কিছু এসে যায় না কে বা কারা এই চেষ্টা করে—রাষ্ট্র বা লেখকের দল বা প্রচারকগোষ্ঠী। একই নিয়ম খাটে। কৃত্রিম উপায়ে I P A Script বা Esperanto চালানো সফল হবার সম্ভাবনা কম, কেননা এই ভাষার লিপির এবং মূল বচন (text) কম। শিক্ষাকর্তা একজনমাত্র। যিনি প্রথমে আবিষ্কার করে চালাতে চেষ্টা করলেন তিনি। তাঁর রচিত নমুনা হল text। প্রকৃত ভাষা যাঁরা স্বাভাবিক ভাবে বলেন তাঁরা সকলেই শিক্ষক। শিক্ষা দান করা হয় যখনই সামাজিক প্রয়োজনে কথা বলা হয়।

বাংলা ভাষার সুর ও ছন্দ

১। ইতিহাস

বাংলা ছন্দ নিয়ে এ পর্যন্ত খুব কম আলোচনা হয় নি। যতদূর জানি এ-বিষয়ে প্রথম লেখক J. D. Anderson। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর A Manual of the Bengali Language বইখানিতে তিনি দেখান যে বাংলায় একটি প্রধান যতি এবং একটি প্রধান ঝোঁক আছে এবং ঝোঁকটা সাধারণত বাক্যের গোড়াতেই পড়ে। উদাহরণ—'উত্তুরে হাওয়া', 'বর্ষাকাল একেবারে।' পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর A Bengali Phonetic Reader এবং 'ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ' বই দুটিতে অ্যাণ্ডারসন সাহেবের থিয়োরীই স্বীকার করে নেন। তবে তাঁর সংগৃহীত উদাহরণের মধ্যে দেখা যায় যে বাংলায় ঝোঁকটা সবসময় গোড়াতেই পড়ে তা নয়, প্রায়ই পড়ে একটা শব্দ ছেড়ে। উদাহরণ—'আমি যেতে পারি নি।' 'তুমি কাল এসো।' এ ছাড়া শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু দেখান যে প্রশ্ন, অসমাপিকা ও সমাপিকা বাংলায় এই তিন রকম ভাবে বাক্য বা উপবাক্য শেষ হতে পারে। এর পর W. Sutton Page তাঁর An Introduction to Colloquial Bengali (১৯৩৪)-তে লক্ষ করেন যে বাক্যের মধ্যে কোনো শব্দের উপর বিশেষ জোর পড়লে তার আরম্ভটা উদারায় নেমে যায়। গদ্যছন্দ নিয়ে এর বেশি কিছু আমার চোখে পড়ে নি।

পদ্যছন্দ নিয়েই বেশির ভাগ আলোচনা হয়েছে। শ্রীযুত

প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' বইটিতে দেখান যে বাংলা পদ্যে তিন রকম ছন্দের ব্যবহার আছে। লৌকিক ছন্দে রুদ্ধদলের দৈর্ঘ্যের বাঁধন নেই, কখনো দীর্ঘ কখনো বা হ্রস্ব হতে পারে। উদাহরণ—'শিবঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান।' ("শিব" হ্রস্ব; "রের" "তিন" "দান" দীর্ঘ)। যৌগিক ছন্দে রুদ্ধদল শব্দের অন্তে দীর্ঘ ও অন্যত্র হ্রস্ব। উদাহরণ—'এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়।' ("দুর" "ভাগ" ও "মঙ্" হ্রস্ব, "দেশ" ও "ময়" দীর্ঘ)। মাত্রিক ছন্দে রুদ্ধদল সর্বত্র দীর্ঘ। উদাহরণ—'ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম উঠিল কলস্বর।" ("মের" "ঘুম" ও "স্বর" দীর্ঘ। "মের-অ", "ঘুম-অ", "স্বর-অ" পড়লেও ছন্দপতন হয় না; "ভাঙল" "উঠল" পড়লেও না)।

শ্রীযুত সুকুমার সেন এই তিনটি পদ্যের ছন্দের পুরনো ও বিভিন্ন প্রস্তাবিত নাম বদলে দিয়ে চমৎকার তিনটি নাম ঠিক করে দেন—বলপ্রধান, তানপ্রধান ও মানপ্রধান। তাঁর 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' বইটিতে তিনি দেখান যে তিনটি ছন্দের একটিতে নির্ভর করা হয় তালে তালে আসা ঝোঁকের উপর, অন্যটিতে টানের উপর, অপরটিতে স্বরের পরিমাণের উপর।

শ্রীযুত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' বইখানিতে বিচার করে দেখান যে বাংলা ছন্দের মধ্যে একটা দু'য়ের তাল ফোটে। উপরোক্ত তিনপ্রকার ছন্দের কোনোটির বেলা এ নিয়মের অন্যথা হয় না। তবে বলপ্রধানে এর প্রকাশ স্পষ্টতম এবং তানপ্রধানে অস্পষ্টতম। উদাহরণ—'শিবঠা—কুরের। বিয়ে—হল॥ তিন—কন্যে। দান॥' 'এদুর—ভাগ্য। দেশ—হতে॥ হেমঙ—গল। ময়॥' 'ঘুমের—দেশে। ভাঙিল—ঘুম॥ উঠিল—কল। স্বর॥' পদ্যছন্দের আলোচনা আমার জানতে এই পর্যন্ত।

লক্ষ করতে হয় যে গদ্যছন্দ ও পদ্যছন্দ দুয়ের একত্র আলোচনা এপর্যন্ত হয়নি। অবশ্য অবিশ্লেষিত অনুভূতিনির্ভর মন্তব্য যথেষ্ট হয়েছে। আমার উদ্দেশ্য গদ্য ও পদ্য মিলিয়ে বাংলার সামগ্রিক ছন্দটার স্বরূপ বিশ্লেষণ।

২। পদ্ধতি

কোনো ভাষার ছন্দ বিচার করতে বসলে কী কী লক্ষ করতে হবে সেটা আগেই বুঝে নেওয়া ভালো। প্রথমে দিঙ্‌নির্ণয়। নিরীক্ষণ করতে হবে চার ধরণের ঘটনার গতি ও সংগতি।

ক. যতিবিচার। প্রথমেই দেখতে হবে যে ছেদ কোথায় কোথায় পড়ছে এবং তা কত ধরণের। প্রত্যেকবার একইভাবে ছেদ পড়ছে এরকম ছেদ ছাড়াও পড়লেও-পড়তে-পারে এই ধরণের ছেদও থাকতে পারে। বাস্তব ছেদ ও সম্ভবপর ছেদেরই কত প্রকার, ছেদের স্থান পরিবর্তন করা যায় কি না এবং বদলালে সঙ্গে সঙ্গে অর্থও বদলায় কি না তাও পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন।

খ. সুরবিচার। স্বর একঘাটে উদ্গারিত হয় না। (ঙ ন ম ল চারটি ধ্বনিও স্বরধর্মী, কারণ মুখের বা নাসার দ্বার তাদের বেলা মুক্তই থাকে)। সুরের যে ওঠা-পড়া হতে থাকে তার মধ্যে কোনো নিয়ম পাওয়া যায় কি? দুই যতির মাঝখানের অংশ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে সুরের ওঠা-পড়া নির্ধারণ করতে ক'টা ঘাটের প্রয়োজন। তবে কথ্যভাষায় ঘাটগুলি সেতারের মত বাঁধা নয়। পরবর্তী যতিনির্দিষ্ট অংশে সব ক'টা ঘাট একসঙ্গে নেমে বা একসঙ্গে উঠে যেতে পারে, ঘাটগুলির পারস্পরিক ব্যবধান বেড়ে যেতে পারে বা কমে যেতে পারে। ঠিক থাকবে শুধু তাদের সংখ্যা ও উঁচু নীচু ভেদ। সঙ্গে সঙ্গে বিচার করে দেখতে হবে সুরের গৎ বদলালে

অর্থের আভাস বদলায় কি না এবং কয় প্রকার অর্থপূর্ণ নক্‌শা আছে।

গ. বলবিচার। সব স্বর সমান জোরের সঙ্গে উচ্চারণ হয় না। কোনোটা বেশি জোর, কোনোটা কম। বল বেশি হলেই যে স্বরের উচ্চতা এবং দৈর্ঘ্যের পরিমাণও বেশি হবে এটা সব ভাষার বেলা সত্য নাও হতে পারে। বলের মাত্রা বিচার করে এক দুই তিন বা চার অর্থের বদল করে এমন ক'টা বল আছে দেখতে হবে।

ঘ. সব স্বর সমান দীর্ঘভাবে উচ্চারণ হয় না। এই হ্রস্বদীর্ঘ ভেদের মধ্যে কোনো নিয়ম দেখা যায় কি? এমন হতে পারে যে বিশেষ শব্দের উপর বিশেষ ঝোক ছাড়া নিয়মিত দীর্ঘতা দেখা যাচ্ছে না। এমন হতে পারে ভাষাতেই হ্রস্ব স্বর ও দীর্ঘ স্বর ভিন্নার্থসূচক বলে স্বীকৃত হয়ে রয়েছে। এমন হতে পারে যে কোনো বিশেষ পরিবেশে, ধরুন রুদ্ধদলে বা একদল শব্দে, স্বর নিয়মিত দীর্ঘ এবং অন্যত্র হ্রস্ব।

কোন্ কোন দিকে চোখ ফেলতে হবে এ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে চাই যথাযোগ্য পদ্ধতি। পদ্ধতি মূলত দু'রকম। বাস্তবানুগ পদ্ধতিতে রেকর্ড করে যেতে হয় কী বাস্তবিক উচ্চারিত হচ্ছে, কেমনভাবে হচ্ছে, এবং বাস্তবিক কেমন শোনাচ্ছে। এ পদ্ধতিতে আপনার আমার কান ছাড়াও যন্ত্রপাতির সাহায্য প্রয়োজন। অমন যন্ত্রপাতি আমাদের নেই। সুখের কথা এই যে তার বেশি দূর দরকার নেই। কারণ আমাদের বিশ্লেষণের বস্তু একটা মানবিক শ্রবণনিরপেক্ষ প্রাকৃতিক সত্য নয়। আমরা বিচার করতে বসেছি যা তা আপনি-আমি যা প্রত্যহ হাজার বার গ্রহণ ও প্রস্তাব করছি তারই নিতান্ত মানবিক সত্য। অতএব শ্রেয় হচ্ছে অতি আধুনিক ভাষাতত্ত্বের স্বীকৃত

তুলনানুগ পদ্ধতি। এর প্রধান প্রক্রিয়া হচ্ছে ধ্বনিতে স্বল্পতম পার্থক্যবিশিষ্ট একজোড়া বাক্য নিয়ে সেই পার্থক্যের সঙ্গে অনুরূপ স্বল্পতম পার্থক্যবিশিষ্ট আর-একজোড়া বাক্যের তুলনা।

৩। যতিবিচার

এদের মধ্যে পার্থক্য কী? 'রোজ আমি ও হাসি ক্লাস থেকে ফিরে এসে আমাদের বাড়িতে বসে পুতুল খেলি।' এবং 'রোজ আমি ও হাসি ক্লাস থেকে ফিরে এসে পুতুল খেলি আমাদের বাড়িতে বসে।' পার্থক্য এই যে দ্বিতীয়টাতে "·· বসে"র পরে একটা যতি পড়ছে, প্রথমটার "·· বসে"র পর তা পড়ছে না। প্রথম "বসে"র সঙ্গে "খেলি"র যে পার্থক্য, সেটা কি প্রথম "বসে"র থেকে দ্বিতীয় "বসে"র পার্থক্যের সঙ্গে অভিন্ন? তাই তো মনে হচ্ছে। প্রথম "বসে"র পর চালিয়ে যাবার প্রত্যাশা থাকছে, "খেলি" বা দ্বিতীয় "বসে"র বেলা তা থাকছে না। এই যতিটার লেবেল দেওয়া যাক p এবং প্রথম "বসে"র পর যা ঘটছে তার লেবেল দেওয়া যাক q। এই ভাবে তুলনা করে করে এগলে দেখব যে প্রথম বাক্যটাতে q পড়ছে "রোজ" "হাসি" "এসে" এবং "বসে"র পরে আর p পড়ছে "খেলি"র পরে। বাংলায় তা হলে অন্ততঃ দু-ধরণের যতি আছে। একের জায়গায় অন্যের প্রয়োগ অর্থ বদলে দেয়।

কিন্তু দুটোতেই ইতি নয়। "আপনি এলেন?" আর "আপনি এলেন।" তুলনা করে দেখলে মনে হবে p, q ছাড়া r নামে আর-একটা যতি বাংলা ভাষায় সম্ভব এবং সেটা প্রথম বাক্যটাতে শোনা যাচ্ছে। "রাম ছাত্র?" আর "রাম ছাত্র।" এই জোড়াতেও সেই প্রভেদ। অর্থের তফাত তো স্পষ্ট। তা হলে কি যতি তিনটে? একটু যত্ন করে "রোজ" এবং "হাসি"র মধ্যে তুলনা করলে বোঝা

যায় ধ্বনির একটা পার্থক্য আছে। "রোজ" এবং প্রথম বাক্যের "বসে"র মধ্যেও সেই একই পার্থক্য। "রোজ" আর "এসে"র পরে যে ধ্বনি, "হাসি" আর "বসে"র পরে যে ধ্বনি—তারা এক নয়। দ্বিতীয়টিকে যদি q বলি, প্রথমটিকে s বলে তার থেকে আলাদা করতে হবে। অর্থের পার্থক্য এ ক্ষেত্রে সামান্য। sএর বেলা ঝোঁকটা যেন বেশি। তা ছাড়া আরও বাক্যের সঙ্গে তুলনা করে করে দেখলে বোঝা যাবে যে পর পর দুটো q আসে না, শেষেরটা থেকে গুনলে দ্বিতীয় চতুর্থ ষষ্ঠ স্থানে s পড়ে। বাহুল্যভয়ে প্রমাণ স্থগিত রাখলাম।

তা হলে কি চারটে যতি আছে বাংলা ভাষায়? সন্দেহ হচ্ছে এতগুলো যতি যতিই নয়, অন্য কিছু। আর-একদিকে তুলনা করলে এ সন্দেহটা যে ভিত্তিহীন নয় তা প্রমাণ হবে। "আমি ও হাসি" "ক্লাস থেকে ফিরে এসে" এবং "পুতুল খেলি," বাক্যাংশগুলো তুলনা করা যাক। "থেকে"র পর যে ছেদ পড়ছে, তা "হাসি" "এসে" বা "খেলি"র পর যা যা পড়ছে তার কোনোটার সঙ্গেই অভিন্ন নয়। "থেকে"র পরের ছেদ "আমিও"র পরেকার ছেদের সঙ্গে অভিন্ন। "পুতুল"এর পরের ছেদের সঙ্গেও। এ ছেদের উপর থামা সম্ভব নয়; থামতে গেলেই তার জায়গায় এসে পড়বে p q r s-এর কোনো একটি।

তা হলে বাংলায় সত্যিকার ছেদ আছে মাত্র দুটোই।" একটাকে বলা যেতে পারে যতি, তার উপর থামা যায়। অন্যটার নাম দেওয়া যাক উপযতি, তার উপর থামা যায় না। প্রথমটা দেখানো যাক ± চিহ্ন দিয়ে, দ্বিতীয়টা + চিহ্ন দিয়ে। p q r s-এর মধ্যে যে পার্থক্য তা যতির যতিত্বে নয়। যতিতে পৌঁছবার প্রস্তুতি বা আক্রমে। এদের পার্থক্য সুর, বল বা দৈর্ঘ্য সংক্রান্ত।

৪। সুরবিচার

উপরোক্ত p q r s-এর পারস্পরিক পার্থক্য সুরগত কি না পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। r-এ যেতে সুর চড়ে গিয়ে যতিতে পড়ছে এবং p-তে সুর নেমে গিয়ে যতিতে পড়ছে এ পার্থক্য ধরা বোধ হয় সব চেয়ে সোজা। ব্যাপারটা দুটো লাইন এঁকে দেখানো যেতে পারে। r হচ্ছে ___/± এবং p হচ্ছে ‾‾‾\±। এর পর বিচার করে শুনলে দেখানো যাবে q-এর রূপ হচ্ছে —± (অর্থাৎ সুর সমানভাবে যতিতে পড়ছে) এবং s-এর রূপ —v± (অর্থাৎ সুর একটু নেমে ফের চড়ে গিয়ে যতিতে পড়ছে)।

এর পর বিচার করা যাক অন্য পরিবেশে সুরের উঠাপড়া কিরকম হয়। যতি ± এর অব্যবহিত পরে কি সুরের আক্রম একরকমই? "আমি ও হাসি"র আরম্ভ আর "পুতুল খেলি"র আরম্ভ এ দুয়ের মধ্যে কি পার্থক্য নেই একটা? ঠিক সেই পার্থক্যই কি শোনা যায় না।—"বর্ষাকাল" আর "রবীন্দ্রনাথ" এ দুই শব্দে? একটাতে আক্রমের রূপ সমান ±—, অন্যটাতে উপক্রমের রূপ ±/‾‾‾।

তার পর দেখা যাক +এর দুই পাশ। +এর পরে সুরের আক্রম সাধারণত সমান +—, কিন্তু "বর্ষাকাল একেবারে" বাক্যটাতে তার রূপ +_। +এর আগে তিনরকম আক্রম শোনা যায়। "ক্লাস থেকে ফিরে এল" একটানাভাবে বলে গেলে—·+এর ধ্বনিটা শোনা যায়। কিন্তু সামান্যমাত্র জোর দিলেই যেরকম শোনা যায় তার চিত্র হবে ___/±। এবং "কখনো আসেনি।" প্রথম শব্দটার উপর জোর দিয়ে উচ্চারণ করলে যা শোনা যায় তার রূপ ___^+।

এই আক্রমগুলি একত্রভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এদের সংখ্যা মূলত ৬এর বেশি নয়। সমান ·—, উত্তারিত সমান ∸, উঠতি ./, উত্তারিত উঠতি /˙, পড়তি ˙\, উত্তোলিত পড়তি ˙\.।

ঘাটের হিসেবে এদের দেখাতে হলে তিনটে ঘাট দরকার হবে। তাদের 1, 2, 3 (উদারা, মুদারা, তারা) নাম দেওয়া যেতে পারে। সে হিসেবে আক্রমগুলির রূপ হচ্ছে 22, 11, 23, 12, 21, 32।

এর পর প্রশ্ন, বিস্ময়, আদেশ, অনুরোধ, আপত্তি, সম্মতি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের বেশ কিছুসংখ্যক বাক্য নিয়ে শোনা যেতে পারে পদের সুরের গৎগুলো কিরকম। আমি ১২টার বেশি ছক পাইনি। তালিকা ও উদাহরণ দিচ্ছি। ব্র্যাকেটের অংশ না ও উপস্থিত থাকতে পারে।

± (– – +) – ⁄ ± বা ±(22 – 22+) 22 – 23± । এর প্রয়োগ প্রশ্নে, যদি প্রশ্নবাচক কোনো সর্বনাম আগে না থাকে। উদাহরণ ± আপনি + এলেন ? ±

±(– – +)— ⸜± বা ±(22 – 22+)22 – 23± । এর প্রয়োগ উত্তর, মন্তব্য বা আদেশে। উদাহরণ—± ক্লাস থেকে + ফিরে এল।±

±(– ⁄ +) – – ± বা ±(11 – 12+)22 – 22± এবং

±(– ⁄ +) – ± বা ±(11 – 12+)22 – 12± দুয়ের প্রয়োগ প্রায় একরকম। প্রথমটার প্রয়োগ পরপর দুবার হয় না, দ্বিতীয়টার সঙ্গে পরাবর্তন করতে হয়। একটু ঝোঁক পড়লেই প্রথমটার বদলে দ্বিতীয়টা শোনা যায়। উভয়েরই প্রয়োগবাক্য যে অসম্পূর্ণ, আরও যে বলবার কিছু আছে তা বোঝাতে। উদাহরণ—± ক্লাস থেকে + ফিরে এসে ±

± ⁄ + – ± বা ±23+22± । এর প্রয়োগ বিস্ময়, বিরক্তি বা চ্যালেঞ্জ প্রকাশে। উদাহরণ—(± ধরতে ±) পারে + না ! ± (± এটা ±) কী + করল ! ± ± পাচ্ছি + না। ±

· ± – – + _ __ বা ±22 – 22+11 – 11± । এর প্রয়োগ

নিশ্চিতি জানাতে। উদাহরণ (± এতো ±) বর্ষাকাল+ একেবারে ±

± − ╲ + − ± বা ±22−32+22−21। এর প্রয়োগ প্রশ্নসূচক সর্বনামসমেত প্রশ্নে ও বিশেষ ঝোঁক-সমেত মন্তব্যে। উদাহরণ—+ কোন্‌খানে + গেছলে ? ± ± কথনো + আসেনি। ±

+ − ╱ + ╱ ± বা ±11−12+22−23±। এর প্রয়োগ বিশেষ ঝোঁকসম্পন্ন প্রশ্নে, যদি প্রশ্নসূচক সর্বনাম না থাকে। উদাহরণ—± ভালো + তো ? ±

± ╱ − + ± বা ±12−22+22−22

± ╱ − + − ╱ ± বা ±12−22+22−12

± ╱ − + ╱ + বা ±12−22+22−23

± ╱ − + − ╲ ± বা ±12−22+22−21±। এদের প্রয়োগ উপরোক্তদের অনুরূপ। পার্থক্য এই যে এরা সমাস বা ফ্রেজ চিনিয়ে দেয়। উদাহরণ—± পুতুল + খেলা। ± ± রবীন্দ্র + জীবনী ? ±

৫। বলবিচার

বাংলা শব্দে কোথায় বল পড়বে তা ঠিক করা থাকে না। ইংরেজিতে con´test একটা ক্রিয়াপদ, ´contest একটা বিশেষ্য। বাংলায় তার কোনো তুলনা নেই। বাংলা শব্দের বল নির্ভর করে সুরের ছকে তার স্থানের উপর। ছকের মধ্যে বলের বিতরণের নিয়ম একটা দাঁড় করানো যায়। বল হচ্ছে আগের দিকে এবং উপরের দিকে। ± − − + − ╱ ± বা ±22−22+22−23± ছকটাতে বল বেশি প্রথম ± এর পরে এবং দ্বিতীয় ± এর আগে। +এর পরেও অল্প বল পড়ছে। +এর আগে সবচেয়ে কম বল। ± ╱ − + − ╲ + বা ±12−22+22−21± ছকটাতে সবচেয়ে বল

পড়ছে প্রথম 2-টাতে ("পুতুল খেলি" এর "তুল" দলটাতে।)´+এর পরের প্রথম 2-তেও কিছু বল পড়ছে। অন্যত্র বল নেই। বাংলায় বলবিন্যাস স্বরনির্ভর।

বাংলায় বলবিন্যাসের একটা বিচিত্র প্রমাণ পাওয়া যায় শব্দের সংক্ষেপনধারা পর্যালোচনা করলে। দ্রুত কথনে "খাটুনি" হয়ে যায় "খাটনি", "বাঁকুড়া" হয় "বাঁক্‌ড়ো", "পড়ুয়া" হয় "পোড়ো", "ঠাকুরানী" হয় "ঠাকরান" বা "ঠাকরুন"। লিখনে স্বীকৃতি পায় না এমন সংক্ষেপনের উদাহরণে "ভবানীপুর" হয় "ভনিপুর", "রবীন্দ্রনাথ" হয় "রইন্নাত", "জামাইবাবু" হয় "জ'াইউ"। বলহীন দল দ্রুত কথনে প্রায়ই হারিয়ে যায় সামান্য চিহ্নও না রেখেই।

৬। দৈর্ঘ্যবিচার

বাংলা শব্দে কোথায় স্বরটা দীর্ঘ হবে তা ঠিক করা থাকে না। সংস্কৃত বা ইংরেজিতে হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের পার্থক্য আছে। "দিন" আর "দীন" একদিকে, bit, beat আর-একদিকে এই নিয়মের উদাহরণ। অনুরূপ পার্থক্য বাংলায় নেই। "দিন" আর "দীন" এর বাংলা উচ্চারণে কোনো ধ্বনিগত ভেদ নিয়মিতভাবে শোনা যায় না। তাই বলে কি দীর্ঘ স্বর কোথাও শোনা যায় না ?

দীর্ঘ স্বর খুঁজতে বসলে "রোজ আমি ও হাসি ‥ খেলি।" বাক্যটাতে তা বেশ কয়েক জায়গায় শোনা যায়। "রোজ" দলটিতে স্বর দীর্ঘ। "ক্লাস" দলটিতে এক-একবারে দীর্ঘ স্বর আসে, এক-একবার হ্রস্ব, "দের" দলটিতেও তাই, "তুল" দলটিও তাই। একটু ঝোঁক দিয়ে বললেই এগুলি দীর্ঘ, হালকাভাবে বললে হ্রস্ব। আরো উদাহরণ নেওয়া যাক। "পা" আলাদা বললে দীর্ঘ. "পা"টা বলতে "পা" দলটি এমনিতে হ্রস্ব কিন্তু ঝোঁক পড়লে দীর্ঘ। আরও কিছু

উদাহরণ নিয়ে বিচার করে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় যে বাংলায় স্বরের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে গতের মধ্যে তার স্থানের উপর। একলা একদল শব্দ, অর্থাৎ ± এবং + বা + এবং ± বা + এর অবর্তমানে ± এবং ± এর মধ্যবর্তীস্থানে একদল শব্দের স্বর সর্বদা দীর্ঘ। এ ছাড়া যে দলটাতে বল পড়ছে তার স্বর নিয়মিতভাবে দীর্ঘ না হলেও তাকে দীর্ঘ করা যায়। অন্যান্য স্থানের স্বর নিয়মিতভাবে হ্রস্ব, তাদের দীর্ঘ করা যায় না, যদি না সমস্ত বাক্যের গড়ন ও গৎ বদলে দেওয়া হয়।

এই সঙ্গে আর-একটা প্রশ্ন ওঠে। ছুটি যতির মধ্যে ক'টি দল পড়তে পারে? প্রশ্নটা ঠিক নিখুঁত হল না। কারণ দুই যতির মধ্যে একটি উপযতি থাকলে সমগ্র গৎটা দ্বিগুণ বড় হবে এবং কোনো বিশেষ দলের স্বর দীর্ঘ হতে পারে। যতি ও উপযতির বা উপযতি না থাকলে দুই যতির মধ্যবর্তী অংশটার নাম দেওয়া যাক উপগৎ এবং হ্রস্ব স্বরে দৈর্ঘ্যের পরিমাণকে এক মাত্রা বলে ধরা যাক। এবার প্রশ্নটা দাঁড়াবে একটি উপগতে ক'টি মাত্রা থাকতে পারে? "রোজ" দুই মাত্রা "ক্লাস থেকে" বা "আমাদের" তিন মাত্রা, "ফিরে এসে" চার মাত্রা, "বাড়িতে বসে" পাঁচ মাত্রা, "বাড়িতে বসিয়ে" যদি বলি তা হবে ছয় মাত্রা। লক্ষ করলে অমূল্যবাবুর থিয়োরিটার সত্যতা স্বীকার করতেই হবে যে এদের মধ্যে একটা দু'য়ের তাল ফুটে উঠছে। দুই যেন।—।, তিন যেন॥—। বা।—॥, চার যেন ॥—॥, পাঁচ যেন ॥।—॥ বা ॥—॥।, ছয় যেন ॥।—॥। প্রতীত হচ্ছে। মাত্রাগুলির ঝোঁকছুটির মাঝখানে উপযতির চেয়েও ছোট যে ছাড় আছে তার নাম দেওয়া যাক ভাজক।

৭। পদ্যের ছন্দ

সকলেই জানেন যে বাংলায় তিনপ্রকার পদ্যছন্দ। বলপ্রধান

ছন্দে রুদ্ধ দল ইচ্ছামত হ্রস্ব বা দীর্ঘ। তানপ্রধান ছন্দে রুদ্ধ দল শব্দের অন্তে হলে দীর্ঘ, অন্যত্র হ্রস্ব। মানপ্রধান ছন্দে রুদ্ধ দল সর্বত্র দীর্ঘভাবে উচ্চারণ করতে হবে। তিনটি নিয়মই কৃত্রিম। কিন্তু কৃত্রিমতা না মানলে তো পদ্যের বাঁধন আসবে না। তাছাড়া প্রথমটাতে যে নাচের এবং দ্বিতীয়টাকে যে গানের আমেজ পাওয়া যায় তা বলপ্রধান ও তানপ্রধান নাম দুটোতেই প্রকাশ হচ্ছে। নতুন পদ্ধতিতে সেই অনুভূতিলব্ধ নাম দুটোর যথার্থতা কতদূর বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

বলপ্রধান ছন্দের নমুনা "ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল বর্গী এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।" স্বরের ওঠাপড়া বিচার করলে, এর ছক হবে ±—±—±—±—±—+—±—±╲±। নমুনাটাতে "বর্" ও "ধান" দীর্ঘ এবং উপগতের ছক ‖—‖। তাল। সামনের দিকেই ঝোঁক পড়ছে, কারণ তার পরে আর উচ্চতর ঘাট কোথাও ছোঁওয়া হচ্ছে না। "বিষ্টি পড়ে" উদাহরণটা নিলাম না এই কারণে যে কেউ কেউ ওটা তানপ্রধান ছন্দে পড়েন, যদিও ওটা বলপ্রধান ছন্দেই পড়া উচিত। বলপ্রধান ছন্দে পড়লে "বিষ্টি পড়ে"র গৎ একই, কিন্তু উপগতের ছক ‖—‖ তাল।

তানপ্রধান ছন্দের নমুনা—"এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়, দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়।" গৎ ±╱‾‾‾+╱‾‾‾+╱‾‾‾+ – ±╱‾‾‾+╱‾‾‾+╱‾‾‾+╲±। এর উপগতের ছক ‖—‖ তাল। লক্ষ করতে হবে যে যতির প্রয়োগ পঙ্‌ক্তির ভিতরে কোথাও নেই। বল পড়ছে প্রত্যেক উপগতের দ্বিতীয় এবং শেষ উপগতের প্রথম দলটিতে। "দুর্" এর উপর একটা ঝোঁক যে পড়ছে তাতে কোনো ভুল নেই। "মঙ্", "ব", "ময়", এবং "ভয়" এর উপরও ঝোঁক পড়ছে: "দেশ", "দূর" এবং "দাও" এর বেলা উচ্চারণ দুই মাত্রার

হচ্ছে এবং ঝোঁক পড়ছে দ্বিতীয় মাত্রাটির উপর। আরেকটা উদাহরণ নিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। "ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী, একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি।" এতে ঝোঁক পড়ছে প্রত্যেক দ্বিতীয় দলে এবং পঙ্‌ক্তিশেষে "টনী" আর "প" র উপর। এ ছন্দে গানের রেশ আসে সামনের থেকে ঝোঁকটা সরিয়ে দেওয়া এবং যতির বদলে উপযতির প্রয়োগ এই দুই কৌশলে।

মানপ্রধান ছন্দের নমুনা—"ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম উঠিল কলস্বর, গাছের শাখে জাগিল পাখি কুসুমে মধুকর।" এর গৎ + / —— + — + / —— + — ± / —— + — ± / —— + \ + । এর উপগতের ছক ॥।-॥ তাল। লক্ষ করতে হয় যে যতি ও উপযতি এবং তাদের পরে সমান আক্রম ও উঠতি আক্রমের পরাবর্তন। আরেকটা উদাহরণ নিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। "হে বিরাট নদী, অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল, অবিরল চলে নিরবধি।" এর গৎ ± — + / —— ± / —— + — + / —— ± / —— + — ± — + / —— ± । অবিরল, এর উপগতের ছক প্রথম ও শেষ পঙ্‌ক্তির গোড়ার দুটোতে ।—। তাল, অন্যগুলোতে ॥—॥ তাল। এই স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই মানপ্রধান ছন্দের অতুলনীয় ঐশ্বর্য।

৮। উপসংহার

বাংলা ভাষায় গদ্যের ও পদ্যের যে ছন্দ তার রূপাবলী নির্ণয় করতে গিয়ে ১০টি পৃথক উপাদান স্বীকার করতে হয়। এদের তালিকা দিচ্ছি—

যতি ±

উপযতি +

ভাজক —

মাত্রা ।

সমান আক্রম ·—· বা 22

উত্তারিত সমান আক্রম ∸ বা 11

উঠতি আক্রম ./. বা 23

উত্তারিত উঠতি আক্রম ˙/˙ বা 12

পড়তি আক্রম ˙˙\ বা 21

উত্তোলিত পড়তি আক্রম ..\. বা 32
